৩১ আগস্ট ১৯৫৯।
ঐতিহাসিক খাদ্য আন্দোলনের শহীদ দিবস।

সংগ্রামী হাতিয়ার

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র

বিশেষ তৃতীয় ই-সংস্করণ, আগস্ট '২০২০ ■ ৪৮তম বর্ষ

আমেরিকায় আর্থিক সঙ্কট ও যুদ্ধ বিরোধী মিছিল

'ভারত বাঁচাও' কর্মসূচীতে শামিল রাজ্য কর্মচারীরা

বর্ধমান

কোচবিহার

মহাকরণ

মধ্যাঞ্চল

লবণহ্রদ

বাঁকুড়া

করোনা বিধি মেনে কোয়ারেন্টিনে থেকেও প্রতিবাদে বিজয় শঙ্কর সিংহ

মালদা

নব মহাকরণ

দক্ষিণাঞ্চল

উত্তর দিনাজপুর

৯ আগস্ট, ঐতিহাসিক 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের দিনটিতে কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী ও দেশবিরোধী নীতির প্রতিবাদে 'ভারত বাঁচাও' কর্মসূচীর ডাক দিয়েছিল কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও জাতীয় ফেডারেশনগুলি। কৃষি বাঁচাও, কৃষক বাঁচাও, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি রোধ করো, জনবিরোধী বিদ্যুৎ আইন বাতিল করো, রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থার বেসরকারীকরণ করা চলবে না, শ্রম আইন সংশোধন সংক্রান্ত অর্ডিন্যান্স বাতিল করো প্রভৃতি দাবিতে আহূত এই কর্মসূচীর দেশের বিভিন্ন রাজ্যের সাথে পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলাতেও কোভিড-১৯ সংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রতিপালিত হয়। এ রাজ্যের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় দাবিগুলির সাথে করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক ব্যর্থতা এবং আমফান ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত জেলাগুলিকে ত্রাণ বণ্টনে শাসক দলের দুর্নীতির প্রসঙ্গগুলিও যুক্ত হয়।

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির আহ্বান

গৃহীত 'ভারত বাঁচাও' কর্মসূচীর প্রতিপালন সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের শরিক। স্বভাবতই বিভিন্ন রাজ্যের অ্যাফিলিয়েটেড সংগঠনগুলির কাছে সর্বভারতীয় ফেডারেশন 'ভারত বাঁচাও' কর্মসূচী পালনের ডাক দেয়। এই আহ্বানকে সামনে রেখে, ৯ আগস্ট ছুটির দিন থাকার কারণে, ১০ আগস্ট রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি ঐ কর্মসূচী রূপায়ণের সিদ্ধান্ত নেয়। কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরে গৃহীত সাধারণ দাবিগুলির পাশাপাশি স্বাস্থ্য পরিষেবার সাথে যুক্ত চিকিৎসক, নার্সিং স্টাফ ও স্বাস্থ্য কর্মীদের শারীরিক

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে

উত্তর ২৪ পরগনা

পূর্ব মেদিনীপুর

পুরুলিয়া

সম্পাদকীয়

হিটলার ও তাঁর ভারতীয় অনুচরবৃন্দ

নয়া উদারবাদী অর্থনীতি, অর্থাৎ অতি চঞ্চল আন্তর্জাতিক লগ্নীপুঁজির করাল গ্রাসে আবিশ্ব রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির সাবালকত্ব ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাওয়ার সমান্তরালে, রাষ্ট্রগুলির অভ্যন্তরে রাজনৈতিক স্তরে যে পরিবর্তনগুলি সাধিত হতে থাকে, তার মধ্যে অন্যতম হলো অতি দক্ষিণপন্থী শক্তিসমূহের উত্থান এবং বহু ক্ষেত্রেই অকস্মাৎ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় উল্লম্ফন। ফলস্বরূপ, যে সমস্ত দেশে বহু ঝড়-ঝাপটা সহ্য করেও, বুর্জোয়া ভাবাদর্শের ভিতের ওপর অস্বচ্ছ জনহিতৈষণার আবরণ জড়িয়ে গণতান্ত্রিক কাঠামো এখনও টিঁকে রয়েছে, সেই সমস্ত গণতান্ত্রিক কাঠামোগুলি চরম দক্ষিণ পন্থার আগ্রাসী আস্ফালনে দুর্বল ও ন্যুব্জ হয়ে পড়ছে। গণতান্ত্রিক কাঠামোগুলির ছত্রছায়ায় দেশের জনসাধারণের জীবন ও জীবিকার যতটুকু উর্বর জমি গড়ে উঠেছিল, চরম দক্ষিণপন্থী স্বৈরতন্ত্রের বেপরোয়া পদচারণায় সেই উর্বরতাটুকুও অপসৃয়মান।

এই সাধারণ প্রবণতাগুলি, যা বিশ্বের সমস্ত মহাদেশেরই বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন মাত্রায় প্রতিফলিত হচ্ছে, তা এক সংহত চেহারায় আত্মপ্রকাশ করেছে আমাদের দেশে। বিংশ শতাব্দীতে দুটি বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী পর্বে উত্থিত ফ্যাসিবাদী মতাদর্শের প্রতি অনুগত একটি উগ্র দক্ষিণপন্থী শক্তি আজ ভারতীয় সমাজের সর্বক্ষেত্রেই তার শাখা-প্রশাখার বিস্তার ঘটাতে শুরু করেছে। এই প্রসঙ্গে পাঠক বন্ধুদের কাছে একটি বিধিসম্মত সতর্কীকরণ হলো ঃ এই উগ্র দক্ষিণপন্থী শক্তি বলতে কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টিকে বোঝানো হচ্ছে না। এই শক্তির উত্থান ও বিস্তারে ভারতীয় জনতা পার্টির অবশ্যই একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এই সময়ে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলটি, সমগ্র শক্তিটির একটি উপাঙ্গ মাত্র। তবে অতীব গুরুত্বপূর্ণ উপাঙ্গ। কারণ এই উপাঙ্গটি নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা নিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার ফলে, চরম উগ্র দক্ষিণপন্থী তথা ফ্যাসিবাদী সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের পক্ষে তার নিজস্ব কর্মসূচীকে রূপায়িত করার কাজটি সহজতর হচ্ছে। দীর্ঘ সময় ধরে যা ছিল তাদের প্রচারমূলক কর্মসূচী, তা আজ প্রায়োগিক স্তরে পৌঁছোতে পেরেছে রাষ্ট্র ক্ষমতা করায়ত্ব হওয়ার ফলেই। জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের বিশেষ সাংবিধানিক মর্যাদা কেড়ে নেওয়া, বাবরি মসজিদের জমিতেই রামমন্দির নির্মাণ, জাতীয় নাগরিক পঞ্জীর মাধ্যমে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিক পরিচিতি ও অধিকার কেড়ে নেওয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ বা আর এস এস-এর আদর্শগত অবস্থানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মসূচী। যার চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো, ভারত নামক এই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রটিকে হিন্দুরাষ্ট্রে রূপান্তরিত করা। সুতরাং এই প্রতিটি পদক্ষেপ বি জে পি নামক রাজনৈতিক দলটির নির্বাচনী সংগ্রামে জয়ী হওয়ার জন্য সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের কর্মসূচী হিসেবে দেখলে, এর বিপদকে লঘু করেই দেখা হবে। কারণ সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ব্যবহার করে রাষ্ট্র পরিচালনার রাশ হাতে নেওয়ার প্রচেষ্টা, এদের মূল লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার পথ মাত্র, মূল লক্ষ্য নয়।

এই প্রসঙ্গে বলা ভালো, অ্যাডল্ফ হিটলার এদের আদর্শগত গুরুই শুধু নয়, কর্মপদ্ধতির প্রশ্নেও এরা অনেকাংশেই হিটলারকে অনুসরণ করছে। হিটলারও জার্মানির সংসদীয় নির্বাচনকে ব্যবহার করে, বিভিন্ন 'পপুলিস্ট' স্লোগান আউড়ে জার্মানবাসীর 'মসিহা' হিসেবে নিজেকে প্রথমে চিত্রিত করেছিলেন। নিজের চারপাশে জড়ো করেছিলেন জনগণের রাজনৈতিক সমর্থন। এই পথ বেয়েই তার প্রথম অভিষেক হয়েছিল জার্মানির প্রধানমন্ত্রী হিসেবে, সেখান থেকে আরোহন করেছিলেন সর্বোচ্চ চ্যান্সেলর পদে। কিন্তু গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নিরঙ্কুশ ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পর, গণতন্ত্রের প্রতিটি সৌধকে এক এক করে ভেঙেছিলেন। এমনকি সে দেশের সংসদ ভবন 'রাইখস্ট্যাগে' আগুন লাগিয়ে তার দায় চাপাতে চেয়েছিলেন নিজের রাজনৈতিক ও আদর্শগত শত্রু কমিউনিস্টদের ওপর। এদেশে এখনই একই মাত্রায় না হলেও, হিটলারিয় ক্ষমতার আস্ফালনের অজস্র নমুনা গত কয়েক বছর ধরে, বিশেষত গত লোকসভা নির্বাচনের পরে প্রায়শই প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে। যে সংসদ ভবনের দোরগোড়ায় সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে (প্রথম বার) এবং যে সংবিধানে মাথা ঠেকিয়ে (দ্বিতীয় বার) প্রধানমন্ত্রী তাঁর শপথ গ্রহণ করেছিলেন, সেই সংসদ ও সংবিধানকে দুর্বল করার চিত্রনাট্য প্রতিনিয়তই রচিত হচ্ছে। এটা ঠিক, সংসদের নিম্নকক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে ব্যবহার করে জনবিরোধী আইন প্রণয়ন বুর্জোয়া গণতন্ত্রে কোনো নতুন বিষয় নয়। কিন্তু সংসদের নিম্নকক্ষে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও সংসদকে উপেক্ষা করে, প্রশাসনিক স্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আইন প্রণয়ন এক ভিন্ন প্রবণতা। সাম্প্রতিককালে এই ভিন্ন প্রবণতার একাধিক উদাহরণ আমাদের হাতের কাছেই রয়েছে। যেমন সংসদকে উপেক্ষা করে, সংসদে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের মতামতের তোয়াক্কা না করে, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রায়ত্ব ক্ষেত্রের সম্পদ জলের দরে ব্যক্তি মালিকের হাতে তুলে দেওয়া। হিটলারি জমানায় জার্মানিতে ডিক্রী জারি করে স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। শুধুমাত্র কলকারখানায় পরিচালকমণ্ডলী নিয়ন্ত্রিত মালিক শ্রেণীর তাঁবেদার ইউনিয়নগুলিকে শিখণ্ডীর মতো খাড়া করে রাখা হয়েছিল। আমাদের দেশেও প্রচলিত শ্রম আইনের পরিবর্তন ঘটিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর বিভিন্ন অর্জিত অধিকার কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা জোরকদমে শুরু হয়ে গেছে।

তবে তৎকালীন জার্মানির আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার সাথে আমাদের দেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার গুরুতর পার্থক্যও রয়েছে। হিটলারি শাসনের প্রথম পর্বে, মূলত সমরাস্ত্র শিল্পের প্রসার ঘটার ফলে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। এমনকি কর্মসংস্থানের নিরিখে ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে জার্মানির স্থান ছিল এক নম্বরে। অবশ্য যুদ্ধের অস্ত্র তৈরির হাত ধরে ঐ দেশে অর্থনীতির যে 'বুম' সৃষ্টি হয়েছিল, তা ছিল ক্ষণস্থায়ী, অচিরেই সঙ্কট ঘনীভূত হয়। তবুও পার্থক্যটি হলো, আমাদের দেশে শ্রমিকশ্রেণীকে যখন অধিকারহীন করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, তখন অর্থনীতিও কিন্তু সঙ্কটে হাবুডুবু খাচ্ছে। জার্মানির অর্থনীতির মতো কোনো ক্ষণস্থায়ী বুমও সৃষ্টি হয়নি। বিপরীতে কর্মসঙ্কোচন ঘটছে রেকর্ড হারে। ফলত, হিটলারের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির কিছু বস্তুগত ভিত্তি থাকলেও, আমাদের দেশে 'মন কি বাত' বোঝানো শীর্ষ শাসকের জনপ্রিয়তার কোনো বস্তুগত ভিত্তিই নেই। সবটাই চটকদারি আর মিথ্যার গ্যাসে ভেসে বেড়ানো ফানুস।

গুরু এবং শিষ্যদলের আরও একটি সাদৃশ্যের দিকে আমরা নজর দিতে পারি। হিটলারের রাজনীতি ছিল দুই শুঁড়ওয়ালা রাজনীতি। একটি শুঁড়ে ছিল ইহুদি বিদ্বেষ, অপরটি কমিউনিস্ট বিদ্বেষ। আমাদের এখানেও হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির প্রবক্তাদের দুটি শুঁড়। মুসলিম বিদ্বেষ ও কমিউনিস্ট বিদ্বেষ। হিটলার যেমন আর্যরক্তের বিশুদ্ধতা সংক্রান্ত প্রচারকে 'গণ হিস্টিরিয়ার' পর্যায়ে নিয়ে গেছিলেন, তেমনি আর্যদের শ্রেষ্ঠত্ব সংক্রান্ত হিটলারি তত্ত্বের ভারতীয় সংস্করণ হলো ব্রাহ্মণ্যবাদ। হিন্দুত্ববাদীদের হিন্দুরাষ্ট্র আসলে ব্রাহ্মণ্যবাদী রাষ্ট্র। যা পরিচালিত হবে মনুর বিধান অনুযায়ী। আর মনুর বিধানে বর্ণভিত্তিক যে সামাজিক কাঠামোর কথা বলা আছে, সেখানে হিন্দু হলেও শূদ্র তথা দলিতদের স্থান একেবারে নিচে। যেহেতু আর এস এস তার রাজনৈতিক উপাঙ্গটিকে ব্যবহার করে, নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে মূল লক্ষ্যে উপনীত হবার অনুকূল বাতাবরণ তৈরি করতে চায়, তাই নির্বাচনের স্বার্থেই বর্তমান সময়ে ব্রাহ্মণ্যবাদকে কিছুটা পেছনে রেখে, 'হিন্দু' স্বার্থের জিগির তোলা হচ্ছে। কারণ মনুর বিধান অনুযায়ী যাঁরা শূদ্র, তাঁরা সংখ্যায় বিপুল এবং হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে তাঁরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই অংশের ভোট না পেলে নির্বাচনে জেতা সম্ভব নয়। তাই আপাতত হিটলারের মতো সোচ্চারে 'আর্য রক্তের বিশুদ্ধতা তথা ব্রাহ্মণ্যবাদের কথাকে সামনে আনা হচ্ছে না। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় লক্ষণীয়, তা হলো রাজনৈতিক স্তরে যে প্রচার, তাতে ব্রাহ্মণ্যবাদ 'হিডেন' এজেন্ডা হলেও, সামাজিক স্তরে এদের যে কর্মকাণ্ড, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিভাষায় যাকে 'সোশ্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং' বলা হয়, সেখানে কিন্তু সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশ তথা দলিতদের প্রতি এদের প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলন প্রায়শই ঘটে।

হিটলার ছিলেন অন্ধ কমিউনিস্ট বিদ্বেষী। নভেম্বর বিপ্লবের পরবর্তী পর্বে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যে বিপ্লবী পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, তার অন্যতম সম্ভাবনাময় কেন্দ্র ছিল জার্মানি। কিন্তু একচেটিয়া পুঁজির সর্বাধিক প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিনিধি হিসেবে জার্মানির অভ্যন্তরে বিপ্লবের সম্ভাবনাকে ধূলিসাৎ করেই হিটলারের উত্থান। এমনকি পৃথিবীর বুকে প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রটিকে ধ্বংস করার যে লক্ষ্য নিয়ে হিটলার তার সমরাভিযান শুরু করেছিলেন, তাকে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির স্বার্থ জড়িত থাকলেও, আদর্শগত দিক থেকে কমিউনিস্ট বিরোধিতা প্রণোদনা সৃষ্টিকারী ভূমিকা পালন করেছিল। আর এস এস-ও যে অন্ধ কমিউনিস্ট বিরোধি তার সাক্ষ্য গোলওয়ালকার সহ একাধিক তাত্ত্বিক নেতার বিভিন্ন লেখায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। হিটলার ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী লগ্নীপুঁজির সর্বাধিক প্রতিক্রিয়াশীল অংশের প্রতিনিধি। কারণ হিটলারের উত্থান হয়েছিল একটি উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশে, যা সাম্রাজ্যবাদী রূপ পরিগ্রহ করেছিল। বিপরীতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের জন্ম ও বিস্তার (বিভিন্ন শাখা-প্রশাখাসহ) একটি ঔপনিবেশিক দেশে এবং পরবর্তী পর্বে যা উন্নয়নশীল বুর্জোয়া-জমিদার রাষ্ট্র, যেখানে সমাজের বিস্তীর্ণ অংশে বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর আলো পৌঁছোয় নি। ফলে হিটলারের উগ্র জাতীয়তাবাদী প্রচারের উপাদান এবং আর এস এস-র উগ্র জাতীয়তাবাদী প্রচারের উপাদানগুলি চরিত্রগতভাবে কিছুটা ভিন্ন। হিটলারের জাতি বিদ্বেষী প্রচারের জন্য, কোনো জাতির সংজ্ঞা নতুন করে নির্মাণ করতে হয়নি। কারণ জার্মানির অভ্যন্তরে সামাজিক-সাংস্কৃতিক সমস্ত বৈশিষ্টের সমন্বয়ে ইহুদিরা ছিল জাতি। আমাদের দেশে কিন্তু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ওপর জাতি পরিচিতি আরোপ করা হয়েছিল। তত্ত্বের মোড়কে এই অপচেষ্টার শুরু হয়েছিল সাভারকরের মাধ্যমে। পরবর্তী পর্বে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকেরা ও মহম্মদ আলি জিন্নাহ সাভারকরের সহযোগী হিসেবে এই ভ্রান্ত ধারণাকেই পোক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছিলেন। এই যৌথ পরিকল্পনা কিছুটা সফলও হয়েছিল। জিন্নাহর স্বপ্ন সফল হয়েছিল, কিন্তু সাভারকারের স্বপ্ন পূরণ হয়নি। পাকিস্তান ইসলামিক রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও, ভারত হিন্দুরাষ্ট্রের পরিবর্তে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। অথচ, হিটলার তার ইহুদি জাতি বিদ্বেষকে যে ঘৃণ্য মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছিলেন (গ্যাস চেম্বার উবাচ), মুসলিম বিদ্বেষকে সেই মাত্রায় পৌঁছানোর মতো রাজনৈতিক, সামাজিক সমর্থন ও সাংগঠনিক শক্তি আর এস এস-র সেই সময়ে ছিল না। ফলে হিটলারের জুতোয় পা গলানোর জন্য তাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে কয়েক দশক। বর্তমানে পর্যাপ্ত রাজনৈতিক, সামাজিক সমর্থন ও সাংগঠনিক শক্তি অর্জন করে 'মুসলিম জাতি (??)' বিদ্বেষের সুর চড়ানো হচ্ছে ক্রমশ। এন পি আর-সি এ এ-এন আর সি—বিদ্বেষমূলক উগ্র প্রচারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রায়োগিক স্তরের কর্মসূচী। বেতার ভাষণ ছিল হিটলারের বিশেষ পছন্দের বিষয়। আমাদের দেশেও 'মন কি বাত'-এর কথা আমরা সবাই জানি। হিটলার বিশেষ গুরুত্ব দিতেন প্রচারে। তিলকে তাল করা প্রচার। নেতৃত্বে ছিলেন তাঁর প্রচার দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী গোয়েবলস্, নয়া নয়া প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ফলে, আজ সমগ্র প্রচার পরিকাঠামোর বিপুল অগ্রগতি ঘটেছে হিটলারের সময়ের তুলনায়। আর এর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করছে আর এস এস-বিজেপি। শত শত গোয়েবলস্ আজ প্রচারের দায়িত্বে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে স্বাক্ষরিত ভার্সাই সন্ধি চুক্তি ছিল ঐ যুদ্ধে পরাজিত জার্মানির পক্ষে চূড়ান্ত অবমাননাকর। যা জার্মানবাসীকে মানসিকভাবে আঘাত করেছিল। মানসিক আঘাত জন্ম দিয়েছিল ক্ষোভের। অবমাননাকর চুক্তিকে প্রত্যাঘাত করার অবদমিত জনআকাঙ্খাকে কৌশলে অর্গলমুক্ত করেছিলেন হিটলার। একেই পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করে তাঁর রাজনৈতিক জমিটাকে পোক্ত করেছিলেন। আমাদের দেশে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে প্রাপ্ত খণ্ডিত স্বাধীনতা দেশবাসীর অতৃপ্তির কারণ হলেও, ভারতবাসীর মনে জার্মানবাসীর মতো কোনো অবদমিত ক্ষোভের সৃষ্টি যে করেনি, তার কারণ হলো গৌরবোজ্জ্বল স্বাধীনতা আন্দোলন তথা জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। বহু ধারায় প্রবাহিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের দুর্বার স্রোতই ব্রিটিশদের বাধ্য করেছিল ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে। তাই অবমাননার পরিবর্তে গর্বানুভূতিই কাজ করেছিল স্বাধীনতা প্রাপ্তির লগ্নে। স্বভাবতই জার্মানিতে ভার্সাই চুক্তি উত্তর পরিস্থিতিকে যেভাবে ব্যবহার করতে পেরেছিলেন হিটলার, ভারতে স্বাধীনতা উত্তর পরিস্থিতিকে সেইভাবে ব্যবহারের সুযোগ পায়নি আর এস এস। ফলস্বরূপ হিন্দু গৌরবের 'মিথ' নির্মাণ করার জন্য তাদের চলে যেতে হয়েছে ইতিহাসের অনেকটা প্রাচীন অধ্যায়ে। শিবাজী, রানাপ্রতাপ, পৃথ্বিরাজ চৌহান থেকে সুপ্রাচীন বেদ পর্যন্ত। এমনকি রামায়ন, মহাভারতের মতো পুরাণকাহিনীকেও ইতিহাসের অঙ্গ হিসেবে বর্ণনা করা হচ্ছে।

বিশ্বকে করতলগত করার স্বপ্ন দেখা হিটলারকে বাঙ্কারের মধ্যে আত্মহত্যায় বাধ্য করেছিল সোভিয়েত লাল ফৌজের বীর সেনানীরা। এটা যদি ইতিহাসের একটি পৃষ্ঠা হয়, অপর পৃষ্ঠায় লেখা রয়েছে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গড়ে ওঠা ফ্যাসিবাদ বিরোধী মঞ্চ। যে মঞ্চগুলিতে শামিল হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, রমা রোল্যাঁ, অঁরি বরবুস, অ্যালবার্ট আইনস্টাইন, চার্লি চ্যাপলিনের মতো ব্যক্তিত্ব। যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াইয়ের পাশাপাশি মতাদর্শগত স্তরে লড়াই পরিচালিত হয়েছিল ঐ মঞ্চগুলি থেকে। আমাদের দেশেও ফ্যাসিস্ট ধর্মী হিন্দুত্ববাদী মতাদর্শের বিরুদ্ধে মতাদর্শগত লড়াই পরিচালনার জন্য গড়ে তোলা প্রয়োজন ব্যাপক মঞ্চ। যেখানে শামিল হবেন বুদ্ধিজীবী থেকে শুরু করে শ্রমিক, কৃষকের প্রতিনিধিরাও। এই মঞ্চ নির্বাচনে কোনো দলকে পরাজিত করার মঞ্চ নয়। এই মঞ্চ হবে হিন্দুত্ববাদকে এদেশের বুক থেকে সমূলে উৎপাটিত করার মঞ্চ। □

১ সেপ্টেম্বর, ২০২০

শোক সংবাদ

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জী

গত ৩১ আগস্ট, ২০২০ ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি তথা এদেশের বর্ষীয়াণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব প্রণব মুখার্জীর জীবনাবসান ঘটে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। বেশ কিছুদিন মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত অসুস্থতার কারণে তিনি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। এমনকি তাঁর করোনা সংক্রমণও ধরা পড়ে। প্রয়াত প্রণব মুখার্জী তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে সংসদের নির্বাচিত সদস্য হিসেবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন এবং বহু বছর ধরে বিভিন্ন সরকারের একজন শীর্ষ মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বের সাথে তিনি সুসম্পর্ক বজায় রাখতেন এবং সরকার ও বিরোধী পক্ষের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব দেখা দিলে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করতেন। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি তাঁর প্রয়াণে শোক জ্ঞাপন করছে। □

শিবশঙ্কর রায়

গত ৬ আগস্ট, ২০২০ সকালে কমরেড শিবশঙ্কর রায় প্রয়াত হয়েছেন। ১২ই জুলাই কমিটির প্রাক্তন যুগ্ম-আহ্বায়ক কমরেড রায় ৫ আগস্ট সন্ধ্যায় অসুস্থ হয়ে কলকাতায় ফোর্টিজ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন।

কমরেড রায় এ রাজ্যের তথা দেশের ডাক-তার কর্মচারী আন্দোলনের, রাজ্যের কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের তথা মধ্যবিত্ত শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক আন্দোলনের একজন সুদক্ষ সংগঠক এবং গুরুত্বপূর্ণ নেতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। নীতি ও আদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা এবং পরিশ্রম তাঁকে ক্রমান্বয়ে নেতৃত্বের শীর্ষে উন্নীত করেছিল।

অবসরপ্রাপ্তদের সংগঠন সমূহের যৌথ মঞ্চ গড়ে তুলে দীর্ঘদিন নেতৃত্ব প্রদান করেছেন। এভাবেই আমৃত্যু তিনি মধ্যবিত্ত শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনের অকৃত্রিম বন্ধু হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সুবক্তা ও সুলেখক হিসেবেও তিনি ছিলেন সকলের প্রিয়। □

আমরা স্মরণ করছি

● দার্জিলিং জেলা পেনশনার্স সমিতির নেতা কমরেড এ বি থাপা ● পশ্চিমবঙ্গ গ্রুপ ডি সমিতি, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সংগঠক কমরেড খোকন মজুমদার ● রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি দক্ষিণাঞ্চলের প্রাক্তন সভাপতি কমরেড অমলকৃষ্ণ চক্রবর্তী ● এন এম টি ই এ-র উত্তর ২৪ পরগণা জেলার প্রাক্তন দপ্তর সম্পাদক কমরেড অমল নাগ ● এন এম টি ই এ-র উত্তর ২৪ পরগনা জেলার প্রাক্তন সভাপতি কমরেড গোবিন্দলাল চক্রবর্তী ● জলপাইগুড়ি জেলার কর্মচারী আন্দোলনের নেতা কমরেড সুজন দত্ত ● বর্ধমান জেলার সংগঠক কমরেড প্রশান্ত মণ্ডল ● গ্রুপ ডি সমিতির দার্জিলিং জেলার প্রাক্তন সম্পাদক অবিনাশ মোদক ● বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর মহকুমার প্রাক্তন সম্পাদক কমরেড কিশলয় বিকাশ দে ● এছাড়াও এই সময়কালে করোনা সংক্রমণের কারণে যে সমস্ত কর্মচারী বন্ধু বা তাঁদের পরিবারের সদস্যরা প্রয়াত হয়েছেন। □

জাতীয় শিক্ষানীতি ঃ ভারতের পশ্চাদমুখী উল্লম্ফন

প্রভাত পাটনায়েক

জাতীয় শিক্ষানীতির মতো একটি দলিলে, কিছু পোষাকি কথা ও নতুন বিধানের মধ্যে, এমনকি নতুন বিধানে পুরোনো পোষাকি কথাগুলিকে বাদ দেওয়ার প্রসঙ্গগুলিকে উপলব্ধি করা দরকার। তাই "শিক্ষা সকলের স্বার্থে", "মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৬ শতাংশ শিক্ষাখাতে ব্যয় করা প্রয়োজন" প্রভৃতি প্রবাদগুলি পোষাকি কথা ছাড়া আর কিছুই নয়, যদি না ঐ লক্ষ্যগুলিতে পৌঁছনোর জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করা হয়।

সংক্ষেপে বলা যায়, কিছু পুরোনো পোষাকি কথার পুনরাবৃত্তি তাৎপর্যহীন শুধু নয়, তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়গুলিকে এড়িয়ে যাওয়াও বটে। অথচ জাতীয় শিক্ষানীতিতে এমনই কিছু পুরোনো পোষাকি কথার তাৎপর্যহীন পুনরাবৃত্তি, অন্যান্য সবদিক থেকে যোগ্য বেশ কিছু পর্যবেক্ষকদেরও মনে ধরেছে, এমনকি আদ্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল এবং সমানাধিকার ভিত্তিক সমাজ গঠনের লক্ষ্য থেকে পিছিয়ে আসার কিছু নীতির অনুমোদনও আদায় করে নিয়েছে।

পশ্চাদগমনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনটি হলো, সামাজিক ও আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া মানুষকে শিক্ষার পরিধি থেকে বাদ দেওয়া। এই দলিলে সামাজিকভাবে শোষিত অংশের জন্য শিক্ষায় সংরক্ষণের প্রসঙ্গে কার্যত কোনো ইতিবাচক সুপারিশের উল্লেখ পর্যন্ত নেই; এবং একেবারে কেন্দ্রীয় সরকারের নাকের ডগায়, মানে, তাদের নীরব সমর্থন নিয়ে, জে এন ইউ-র মতো বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যেভাবে সংরক্ষণ বিষয়টির কবর খোঁড়া হচ্ছে, তাতে দলিত ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী থেকে আসা ছাত্রদের শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চনা একেবারে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

পাশাপাশি, নয়া শিক্ষানীতিতে শিক্ষার বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়াকে উৎসাহ প্রদান করার ফলে আর্থিক কারণেও বঞ্চনার আশঙ্কা রয়েছে। অসংখ্য কলেজকে আর্থিক স্বাধিকার সহ সব ধরনের স্ব-শাসনের যে কথা বলা হয়েছে, তার অর্থ হলো, কলেজগুলি নিজস্ব তহবিল গঠনের জন্য ছাত্রদের কাছ থেকে চড়া হারে ফি আদায় করবে, যার ফলে সামাজিকভাবে শোষিত অংশসহ আর্থিক দিক থেকে দুর্বল ছাত্রদের তা নাগলের বাইরে চলে যাবে।

এই নীতির প্রবক্তারা এই প্রসঙ্গে পাল্টা যুক্তি দিতে পারেন যে, দরিদ্র ছাত্রদের জন্য বৃত্তি বা স্কলারশিপের ব্যবস্থা থাকবে। যার অর্থ স্বচ্ছল ছাত্রদের মাধ্যমে পারস্পরিক ভর্তুকি (ক্রস সাবসিডি) ব্যবস্থা চলু হবে। কিন্তু, সত্যিই যদি এমন কোনো ব্যবস্থা চালু হয়, তাহলে স্বচ্ছল ছাত্রদের কাছে প্রতিষ্ঠানটিকে আকর্ষণীয় করার জন্য যে বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ প্রয়োজন, এবং একই সাথে স্কলারশিপের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন, তার সংস্থান করতে হলে 'ফি'-এর হার হবে অত্যন্ত বেশি। যা ছাত্রদের মধ্যে এক ধরনের সামাজিক বিভাজন সৃষ্টি করবে (আমার টাকায় তুমি

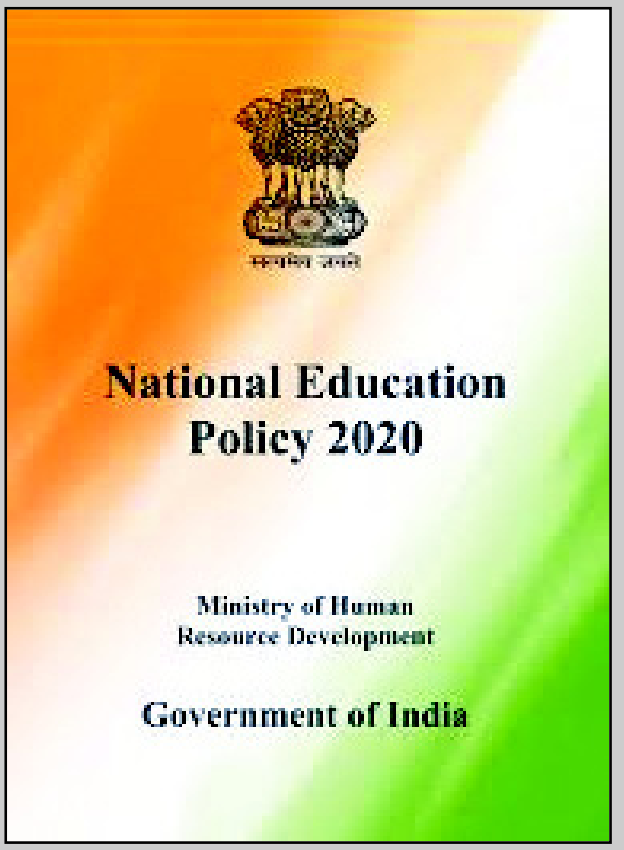

লেখা-পড়া শিখছো), এবং পারস্পরিক সখ্যতাকে ধ্বংস করবে। এই সমস্যার একমাত্র সঠিক সমাধান হতে পারে, সরকারী অর্থে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে সরকারী স্কলারশিপ, ঠিক যা থেকে, নয়া উদারবাদের চৌহদ্দীর মধ্যে পরিচালিত জাতীয় শিক্ষানীতি সরে যাচ্ছে। অর্থাৎ দরিদ্র ছাত্ররা হয় বাদ পড়ে যাবে, অথবা এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছল ছাত্রদের ঠাট্টার পাত্র হয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র হিসেবে থাকতে হবে, যতদিন না তারা ঐ কলেজ থেকে বেড়িয়ে যেতে বাধ্য হয়।

লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, ২০১৯ সালে প্রকাশিত খসড়া জাতীয় শিক্ষানীতি, যাকে ভিত্তি করে বর্তমান জাতীয় শিক্ষানীতির দলিল, সেখানে বেসরকারী এবং সেবামূলক নয় এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অনুমোদন না দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু এই চূড়ান্ত সংস্করণে ঐ বাক্যগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে। একইভাবে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রথমে প্রকাশিত জাতীয় শিক্ষানীতির দলিলে 'শিক্ষার অধিকার' প্রসঙ্গে কিছু কথা বলা ছিল, কিন্তু সরকারী ওয়েবসাইটে এই দলিল দৃশ্যমান করার আগে, 'শিক্ষার অধিকার' সংক্রান্ত বাক্যগুলিকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রকৃত প্রস্তাবে জাতীয় শিক্ষানীতির সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা হলো, একাংশের ছাত্র-ছাত্রীদের ড্রপ আউটের রাস্তা করে দেওয়া, এবং আমাদের ধারণা যা ঘটবেই, যদিও এই 'ড্রপ আউট' প্রক্রিয়াকে তারা প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষার 'নমনীয়' পদ্ধতি বলে আড়াল করতে চাইছে। এই দলিলে স্নাতক স্তরে চার বছরের পাঠক্রমের কথা বলা হয়েছে, যদিও এই ধরনের পরিকল্পনার কারণটা অস্পষ্ট। এই ধরনের পাঠক্রম, ইউপিএ-২ সরকারের আমলে কপিল সিবাল দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় চালু করেছিলেন এবং তার প্রচুর বিরোধিতা হয়েছিল। প্রথম মোদি সরকারের সময় স্মৃতি ইরানি চার বছরের কোর্স বাতিল করে দেন, কিন্তু এখন সেই নীতিই আবার সারা দেশের জন্য পুনরায় লাগু করা হচ্ছে। এই নতুন পাঠক্রমে একজন ছাত্র এক বছর পর একটি সার্টিফিকেট নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে, এবং দু'বছর পর ডিপ্লোমা নিয়ে। অথচ এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে এক বছর বা দু'বছরের কোনো সংক্ষিপ্ত পাঠক্রমের প্রস্তাবনা নেই। তার মানে এক বছর বা দু'বছর পরে কেউ বেরিয়ে যেতে চাইলে, তাকে চার বছরের কোর্সের মাঝপথেই শিক্ষা অসম্পূর্ণ রেখে বেরিয়ে যেতে হবে। এর অর্থ হলো নয়া শিক্ষানীতি 'ড্রপ আউট' প্রক্রিয়াটিকেই আইনসিদ্ধ করে ফেলতে চাইছে। বিনিময়ে ড্রপ আউট ছাত্র-ছাত্রীদের সান্ত্বনা দেবার জন্য সার্টিফিকেট বা ডিপ্লোমা নামে একটুকরো কাগজ ধরিয়ে দেওয়া হবে। এই একটুকরো কাগজের বিনিময়ে কোনো উল্লেখযোগ্য কর্মসংস্থানের সুযোগ পাওয়া যাবে না, এক-দু'বছর মাত্র কলেজে কাটানোর ফলে যথেষ্ট শিক্ষালাভ হবে না, এমনকি তেমনভাবে কলেজ জীবনের অভিজ্ঞতাও হবে না। সুতরাং এটা বলা যায়, নয়া শিক্ষানীতির ভাবনা হলো, অর্ধ শিক্ষিত মানুষের একটা মজুত বাহিনী তৈরি করা, যাদের মধ্যে শিক্ষিত হওয়ার ভ্রম সৃষ্টি হবে। এবং এরা নিশ্চিতভাবেই সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে বঞ্চিত অংশের মানুষই হবে।

স্বাধীন ভারত নয়া জাগরণের অংশ হিসেবে, সকলের কাছে শিক্ষার সুযোগ পৌঁছে দেওয়ার যে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছিল, এটি তার হাস্যকর অনুকরণ। একইভাবে মানুষকে কেরিয়ার কেন্দ্রীক পাঠক্রমের দিকে ঠেলে দেওয়া, ন্যূনতম কয়েকটি বছরের সাধারণ শিক্ষা ছাড়াই বৃত্তিমূলক শিক্ষায় যুক্ত করে দেওয়া, এই সবকিছুর মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার যুব সমাজের প্রতি দায়িত্ব থেকে তার হাত ধুয়ে ফেলতে চাইছে। সরকার প্রজাতন্ত্রের নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার মতো শিক্ষাও তাদের দিচ্ছে না, আবার উপযুক্ত কাজও দিতে পারছে না। সরকার এদের যৎকিঞ্চিৎ প্রশিক্ষণ দিয়ে বাজারে ঠেলে দিতে চাইছে, এবং তারপর তাদের নিজেদেরই বেঁচে থাকার রাস্তা খুঁজে নিতে হবে।

নয়া শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক স্তরে কয়েক বছর মাতৃভাষায় শিক্ষা, যা সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সংখ্যাগুরুর ভাষা না হয়ে কোনো আঞ্চলিক ভাষাও হতে পারে, সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তা প্রান্তিক মানুষকে শিক্ষাঙ্গন থেকে ব্রাত্য করে দেওয়ার প্রেক্ষিতে এই প্রস্তাবনা উপহাস ছাড়া আর কিছুই নয়। এই প্রস্তাবনাকেই স্বাগত জানানো যেত যদি এর সাথে, একটি কার্যকরী সংরক্ষণ নীতির উল্লেখ থাকতো, যাতে প্রাথমিক স্তরে এই ধরনের শিক্ষা যারা গ্রহণ করবে, ভবিষ্যৎ শিক্ষা জীবনে তারা কোনো অসুবিধার মধ্যে না পড়ে। কিন্তু এই ধরনের কোনো সংরক্ষণ ছাড়া, শুধুমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা, সাধারণ ছাত্রদের সামনে এক ধরনের প্রতিকূল পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে, যার ফলে তাদের পক্ষে খুব বেশি এগনো সম্ভব হবে না।

অভিজাত ও সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে এই ধরনের নিন্দনীয় বিভাজন সৃষ্টি করা নয়া শিক্ষানীতির দ্বিচারিতা। কিন্তু এটাই শুধু নয়। নয়া শিক্ষানীতির দর্শনই হলো, মানুষের কাছে এই দ্বিচারিতাকে গ্রহণযোগ্য করে তোলা। এই নীতির একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো, ছাত্রদের মধ্যে ভারতীয় হওয়ার গর্বের অনুভূতি গড়ে তোলা। অথচ এমন একটি সভ্যতা যার মধ্যে 'অস্পৃশ্যতার' ব্যাধি জড়িয়ে রয়েছে, তার সম্পর্কে সম্ভবত গর্ব অনুভব করা যায় না। তাই নয়া শিক্ষানীতির অনুসারী পাঠক্রমে এই ধরনের কুপ্রথাকে আড়াল করে, সভ্যতার এক অবাস্তব চিত্র অঙ্কন করা হবে।

একইভাবে 'নিষ্কাম কর্ম' একজন মানুষের জীবন-যাপনের

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে

প্রয়াত শ্রমিক নেতা শ্যামল চক্রবর্তী

রাজ্যের গণ আন্দোলন ও শ্রমিক আন্দোলনের প্রবীণ নেতা কমরেড শ্যামল চক্রবর্তীর জীবনাবসান ঘটেছে। গত ৬ আগস্ট বৃহস্পতিবার দুপুরে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। সিপিআই(এম)'র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শ্যামল চক্রবর্তীর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। ফুসফুস ও শ্বাসনালীতে সংক্রমণের কারণে তাঁকে গত ২৯ জুলাই একটি বেসরকারী নার্সিংহোমে ভর্তি করানো হয়েছিল। কোভিড পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ আসার পরে ৩০ জুলাই তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয় আরেকটি হাসপাতালে। এক সপ্তাহ ধরে তিনি সেখানেই চিকিৎসাধীন ছিলেন। গত ৬ আগস্ট বৃহস্পতিবার সকালে ও দুপুরে হাসপাতালেই পরপর দু'বার হৃদরোগে আক্রান্ত হন কমরেড শ্যামল চক্রবর্তী। দুপুর ১টা ৪৫ মিনিটে তাঁর জীবনদীপ নিভে যায়।

কমরেড শ্যামল চক্রবর্তী ছিলেন গত শতাব্দীর ছয় ও সাতের দশকে বাংলার রাজনীতিতে বামমুখী পরিবর্তনের এক নির্ভীক সৈনিক, গণআন্দোলনের থেকে উঠে আসা এক উজ্জ্বল কমিউনিস্ট নেতা।

তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের খুলনা জেলার বাগেরহাট মহকুমার গোয়ালমাঠ গ্রামে ১৯৪৩ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি কমরেড শ্যামল চক্রবর্তীর জন্ম। পিতা সুশীল চক্রবর্তী, মাতা অন্নপূর্ণা দেবী। পাঁচ ভাই ও তিন বোন। উদ্বাস্তু হয়ে তাঁদের পরিবার প্রথমে নদীয়ার চাকদহে কিছুদিন ছিল। তারপর দমদম নলতা স্কুল রোড এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন। উদ্বাস্তু পরিবারে কমরেড শ্যামল চক্রবর্তীর ছোটবেলা খুবই দারিদ্র্যের মধ্যে কেটেছে।

স্কুলে পড়ার সময়েই কমরেড শ্যামল চক্রবর্তী বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। ছাত্র আন্দোলন থেকে যুক্ত হন কমিউনিস্ট পার্টিতে। পুলিশি অত্যাচার ও বিনা বিচারে কারারুদ্ধ ছিলেন দীর্ঘ সময়। পশ্চিমবঙ্গে ছয় ও সাতের দশকের উত্তাল ছাত্র আন্দোলনের প্রথম সারির নেতৃত্বে ছিলেন কমরেড শ্যামল চক্রবর্তী।

১৯৭০ সালে এসএফআই গঠিত হলে তার রাজ্য নেতৃত্বে ছিলেন তিনি। ১৯৭৩ সালে শিবপুর সম্মেলনে তিনি এসএফআই'র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৭৯ সালে বারাকপুর রাজ্য সম্মেলন পর্যন্ত এই দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন। এসএফআই-র সর্বভারতীয় স্তরেও তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। দীর্ঘদিন সর্বভারতীয় যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন।

কমরেড শ্যামল চক্রবর্তী অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন ১৯৫৯ সালে। ১৯৭৮ সালে শিশির মঞ্চে অনুষ্ঠিত রাজ্য সম্মেলন থেকে তিনি পার্টির রাজ্য কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৮৫ সালের রাজ্য সম্মেলনের পর তিনি পার্টি রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হন। বিগত রাজ্য সম্মেলনে তিনি রাজ্য কমিটির সম্মানিত সদস্য হন। ২০০২ সালে হায়দরাবাদ পার্টি কংগ্রেসে শ্যামল চক্রবর্তী পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন।

ছাত্র আন্দোলনের পর কমরেড শ্যামল চক্রবর্তী শ্রমিক আন্দোলনে অংশ নেন। পরিবহন শিল্প, বিদ্যুৎ শিল্পসহ কয়েকটি ক্ষেত্রে তিনি সর্বভারতীয় স্তরে নেতৃত্ব দিয়েছেন। সিআইটিইউ পশ্চিমবঙ্গ কমিটির সভাপতি হিসেবেও তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। বিশেষ করে গ্রামীণ অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমজীবীদের সংগঠনে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে তার ভূমিকা অনস্বীকার্য। সিআইটিইউ সর্বভারতীয় কমিটির সহসভাপতি ছিলেন দীর্ঘদিন। ১৯৮১-১৯৯৬ সাল পর্যন্ত তিনি মানিকতলা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ছিলেন। ১৯৮৭ সালে তিনি রাজ্যের পরিবহন দপ্তরের মন্ত্রী হন। ২০০৮ সালে ৩ এপ্রিল তিনি রাজ্যসভার সাংসদ নির্বাচিত হন এবং ২০১৪ সালের ২০ এপ্রিল পর্যন্ত সাংসদ হিসাবে ও রাজ্যের স্বার্থে এবং দেশের শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন।

রাজ্যের বামপন্থী শ্রমিক, কৃষক, ক্ষেতমজুর, ছাত্র-যুব-মহিলা সংগঠনগুলির যুক্তমঞ্চ বিপিএমও (বেঙ্গল প্ল্যাটফর্ম ফর মাস অর্গানাইজেশন) গঠনেও তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল এবং তিনি ছিলেন তাঁর আহ্বায়ক। রাজ্যের শ্রমিক, শিক্ষক, কর্মচারীদের যৌথ মঞ্চ ১২ই জুলাই কমিটি এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের প্রাণপ্রিয় সংগঠন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির লড়াই-আন্দোলনের ক্ষেত্রেও তিনি তাঁর সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করতেন, লড়াই-আন্দোলনের সহযোদ্ধারূপে পাশে এসে দাঁড়াতেন।

কমরেড শ্যামল চক্রবর্তী ছিলেন সুবক্তা এবং সুলেখক। '৬০-৭০ ছাত্র আন্দোলন', 'কাশ্মীর-অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ', ১৯৭৮ ঃ তিন প্রসঙ্গ, ১৯৯৮। সমাজতন্ত্র কী ও কেন প্রভৃতি তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। □

দেবাশীষ রায়

রবীন্দ্র ভাবনা ঃ স্থিরতা ও গতিময়তা

সুমিত ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমগ্র জীবনে (১৮৬১-১৯৪১) যেমন একদিকে স্বদেশের অভ্যন্তরে, অর্থাৎ ঔপনিবেশিক ভারতে বহু ধারায় প্রবাহিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তথা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন প্রত্যক্ষ করেছেন, তেমনই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দুটি বিশ্বযুদ্ধ (যদিও দ্বিতীয়টির পরিণতি তিনি দেখে যেতে পারেননি), পৃথিবীর বুকে প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নির্মাণ যজ্ঞ, ইতালিয় ফ্যাসিবাদ ও জার্মান নাৎসিবাদের উত্থান প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করেছেন। আবার, সবকিছু প্রত্যক্ষ করে, গ্রামসি কথিত 'ক্ল্যাসিকাল ইনটেলেকচুয়ালদের' মতো চরম নিস্পৃহতায় নীরব দর্শকের ভূমিকাও পালন করেননি। উদারমনা কবি মানব হিতৈষণার কষ্টিপাথরে সবকিছুর ফলাফলকে যাচাই করে মতামত ব্যক্ত করেছেন, নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী সক্রিয় ভূমিকা পালনে উদ্যোগী হয়েছেন, তাঁর সংস্পর্শে আসা অপরাপর উদ্যোগী মানুষজনের সাথে আলোচনা-বিতর্ক ও মত বিনিময়ে লিপ্ত হয়েছেন। ফলস্বরূপ কখনও তাঁর পূর্বতন বিশ্বাসে অটল থেকেছেন, কখনও বা পূর্বের চিন্তা থেকে সরে এসে নতুন ভাবনায় নিজেকে সমৃদ্ধ করেছেন এবং তদনুযায়ী তাঁর সংশোধিত কর্মপন্থা নির্ধারণ করেছেন।

বিভিন্ন আলোচনা-বিতর্ক ও মত বিনিময়ের পরেও নিজের পূর্বতন বিশ্বাসে অটল থাকার উপমা হতে পারে, গান্ধীজির নেতৃত্বে পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলন ও চরকার ব্যবহার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দ্বি-মত পোষণ। ব্যক্তি গান্ধীর প্রতি বিপুল শ্রদ্ধা সত্ত্বেও, তিনি বিভিন্ন বক্তৃতা, লেখা, এমনকি মহাত্মা গান্ধীর সাথে ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে তাঁর ভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। আবার তাঁর পূর্বতন ভাবনা থেকে সরে এসে নবমূল্যায়নের ভিত্তিতে সংশোধিত কর্মকাণ্ডে নিজেকে নিয়োজিত করার নিদর্শন হলো ইতালিয় ফ্যাসিবাদ ও জার্মান নাৎসিবাদ সম্পর্কিত বিশ্বকবির ভূমিকা। এই প্রবন্ধে, মূলতঃ এই দুটি বিষয়ের মধ্যেই আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখা হবে। চিন্তার নমনীয়তা এবং চারিত্রিক ঋজুতার এক অত্যাশ্চর্য মেলবন্ধন উপলব্ধির স্বার্থেই প্রসঙ্গ দুটি সম্পর্কে সংক্ষেপে দু-একটি কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন।

শুরুতেই যা উল্লেখ্য তা হলো, গুরুদেব ও মহাত্মার (এই দুই নামেই তাঁরা পরস্পরকে সম্বোধন করতেন) আদর্শগত চিন্তার ফারাক সত্ত্বেও, একে অপরের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। মতানৈক্য কখনও ব্যক্তিগত সৌজন্যবোধে আঁচড় কাটতে পারেনি। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও আস্থার দুটি উদাহরণ উল্লেখ করা যেতে পারে। সত্তেরোর্ধ রবীন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য সঙ্কট এবং বিশ্বভারতীর আর্থিক সঙ্কট প্রায় একই সময় শুরু হয়। তাঁর স্বপ্নের প্রতিষ্ঠানটিকে রক্ষা করার জন্য রবীন্দ্রনাথ তখন ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়েও উদয়াস্ত পরিশ্রম করছিলেন। গুরুদেবের নিজ স্বাস্থ্য সম্পর্কে উদাসীনতায় উদ্বিগ্ন শান্তিনিকেতনের আবাসিকদের একাংশ, অনুযোগ নিয়ে ছুটে যান গান্ধীজীর কাছে। গান্ধীজীও কোনোরকম কালক্ষেপ না করে, শান্তিনিকেতনে এসে রবীন্দ্রনাথকে দুপুরে এক ঘণ্টা করে বাধ্যতামূলক বিশ্রামের পরামর্শ দেন এবং এই ব্যাপারে তাঁকে অঙ্গীকারও করান। গান্ধীজীর পরামর্শ মতো বিশ্রামের অঙ্গীকার গ্রহণ করলেও, বিশ্বভারতীর নিদারুণ আর্থিক সঙ্কট তাঁকে স্থির থাকতে দেয়নি। তিনি 'চণ্ডালিকা' ও 'শ্যামা'-র মতো নৃত্যনাট্য রচনা করে, মহড়া দিয়ে নৃত্যনাট্যের দল নিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ভ্রমণ শুরু করেন। উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বভারতীর জন্য আর্থিক অনুদান সংগ্রহ। খবর পেয়ে গান্ধীজী রবীন্দ্রনাথকে এই পরিশ্রমসাধ্য কাজ থেকে বিরত করেন এবং বিশ্বভারতীর আর্থিক দায়ভার গ্রহণ করেন। একইরকম শ্রদ্ধানুভূতি দেখি রবীন্দ্রনাথের দিক থেকেও। ১৯১৫ সালের মার্চ মাসে পত্নী কস্তুরবাকে নিয়ে গান্ধীজী শান্তিনিকেতনে আসেন। তিনি বিশ্বভারতীয় ছাত্র-ছাত্রী ও অধ্যাপকদের সামনে 'স্বাবলম্বী' হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। গান্ধীজীকে এক ব্যতিক্রমী চরিত্র হিসেবে সম্বোধন করে রবীন্দ্রনাথ সেই বছরেই ১০ মার্চ 'গান্ধী পুণ্যাহ' দিবস প্রতিপালন করেন। যে দিবস এখনও শান্তিনিকেতনে প্রতিপালিত হয়। পারস্পরিক এই সুবিপুল শ্রদ্ধা সত্ত্বেও, গান্ধীজীর নেতৃত্বে পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলন ও বিদেশী দ্রব্য বর্জনের ডাককে রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করতে পারেননি। আবার সমর্থন না করে নীরব থাকাও শ্রেয় মনে করেননি। তিনি স্পষ্ট ভাষায় তাঁর ভিন্নমত ব্যক্ত করেছিলেন। অসহযোগ অন্দোলনের প্রভাব শান্তিনিকেতনের ছাত্র ও শিক্ষকদের ওপরেও পড়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তখন আমেরিকায়। সেখান থেকেই তিনি শান্তিনিকেতনের শিক্ষক জগদানন্দ রায়কে চিঠিতে লেখেন—'ন্যাশনালিজম হচ্ছে একটা ভৌগোলিক অপদেবতা। পৃথিবী সেই ভূতের উপদ্রবে কম্পান্বিত। সেই ভূত ছাড়াবার দিন এসেছে। অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে একই ধরনের সমালোচনা করে, তিনি অ্যান্ড্রুজকেও একাধিক চিঠি দেন। রবীন্দ্রনথের সেই চিঠিগুলি মডার্ন রিভিয়্যু পত্রিকায় ছাপা হয় এবং স্বভাবতই তা গান্ধীজীর নজরে আসে। তিনি কবির ধারণাকে খণ্ডন করার জন্য দুটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রথমটির শিরোনাম ছিল 'English Learning' এবং দ্বিতীয়টির 'Poetic Anxiety : গান্ধীজী বলেছিলেন, কবি তাঁর মত ব্যক্ত করেছেন, 'in anger and in ignorance of factor'।

তবে এই বিতর্কে ইতি টানবার জন্য এবং রবীন্দ্রনাথকে অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষে নিয়ে আসার জন্য গান্ধী অনুরাগীদের লাগাতার প্রচেষ্টা ছিল। ১৯২২ সালের ২৩ জুলাই একদল গান্ধীবাদী অসহযোগ কর্মী জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে এসে রবীন্দ্রনাথকে চরকা কাটা ও অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিতে অনুরোধ করেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও। কিন্তু কবি তাঁদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। শুধু প্রত্যাখ্যান করেই ক্ষান্ত থাকেননি। ঐ বছরেই ২৯ আগস্ট কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে এক সভায়, অসহযোগ আন্দোলনের সমালোচনা করে রবীন্দ্রনাথ 'সত্যের আহ্বান' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এরপরেও গান্ধীজী স্বয়ং একাধিকবার জোড়াসাঁকো ও শান্তিনিকেতনে কবির সাথে দেখা করে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও 'অসহযোগ আন্দোলন' ও চড়কা কেন্দ্রীক গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ মতানৈক্য দূরীভূত হয়নি।

এই প্রসঙ্গটি ছাড়াও, কোনো কোনো মহল থেকে গান্ধীজী সম্পর্কে অহেতুক সমালোচনা করলে যেমন রবীন্দ্রনাথ ব্যথিত হয়েছেন, তেমনই গান্ধীজীর কোনো মন্তব্য বা প্রতিক্রিয়া পছন্দ না হলে, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতেও তিনি দ্বিধা করেননি। ১৯৩৪ সালে 'পুণে প্যাক্ট'-এ গান্ধীর ভূমিকার সমালোচনা করে কোনো কোনো অংশ থেকে প্রকাশ্যে গান্ধীজীকে বয়কট করার ডাক দেওয়া হয়। এর নিন্দা করে রবীন্দ্রনাথ বললেন, "I would be failing in my duty were I not to raise my voice of protest

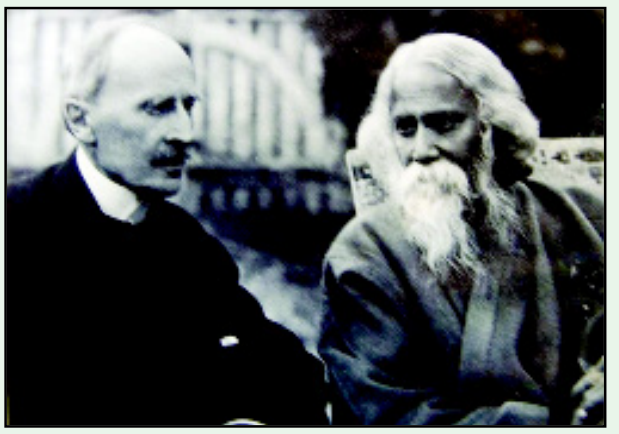

against the slandarous campaign that is being carried on against him. I have often disagreed with him and even quite recently criticized his belief—But I have enough regard for the sincerity of his religious consections and aliding love for poor." আবার ঐ বছরেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রবল ভূমিকম্প হয়। ক্ষয়ক্ষতি সব থেকে বেশি হয় বিহারে। এই প্রসঙ্গে গান্ধীজী বলেন, অস্পৃশ্যতার পাপেই বিহারের জনগণ এই শাস্তি পেয়েছে। এর প্রতিবাদ করে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, মহাত্মা গান্ধীর এই ধরনের বৈজ্ঞানিক যুক্তিবিরুদ্ধ মতামতে আমি দুঃখিত ও বিস্মিত হইয়াছি। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুও এই প্রসঙ্গে গান্ধীর বক্তব্যকে খণ্ডন করে রবীন্দ্রনাথকে সমর্থন করেন।

(দুই)

দেশের অভ্যন্তরে অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে রবীন্দ্রভাবনা একই বিন্দুতে অটল থাকলেও ইউরোপের বুকে ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে রবীন্দ্রভাবনার সরণ ঘটেছে। কিভাবে তা বোঝার জন্য স্বল্প কথায় কয়েকটি প্রসঙ্গের অবতারণা করা যেতে পারে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ উত্তরপর্বে একদিকে যেমন নভেম্বর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা আত্মপ্রকাশ করে, তেমনই যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউরোপে বিভিন্ন দেশে তীব্র অর্থনৈতিক সঙ্কটের কারণে শ্রমিক অসন্তোষ বৃদ্ধি পেতে থাকে। সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন ও ধর্মঘটের উপর্যুপরি ধাক্কায় কেঁপে ওঠে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মাটি। নভেম্বর বিপ্লবের প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণায় পরিচালিত শ্রমিক আন্দোলনের ঢেউ-এ একাধিক দেশে সমাজ বিপ্লবের সম্ভাবনা প্রকট হয়ে ওঠে। আশঙ্কিত হয় ঐ সমস্ত দেশের পুঁজিপতি শ্রেণী।

এই ধরনের তীব্র শ্রমিক অসন্তোষের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল ইতালি। ১৯১৮-২২, ইতালির অভ্যন্তরে দ্রুত কমিউনিস্ট চিন্তাধারার প্রসার ঘটতে থাকে। ঐ দেশের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিক ও গণআন্দোলন তীব্র আকার ধারন করলে, সেই আন্দোলনকে দমন ও বিপ্লবী পরিস্থিতিকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করার জন্য পুঁজিপতি শ্রেণীর সহায়ক হিসেবে এগিয়ে এলেন মুসোলিনী। অরাজকতা দমনের অজুহাতে কিছু ছাঁটাই সৈনিক ও ভাড়াটে গুণ্ডাদের সমন্বয়ে গড়ে তুললেন তাঁর ফ্যাসিস্ট দল (Fasci-di Combattimenti)। যে মুসোলিনী এক সময় নিজেকে সোশ্যালিস্ট বলে জাহির করতেন, তিনিই প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন ইতালির বুকে গণ আন্দোলন ও শ্রমিক ধর্মঘটকে ধ্বংস করা এবং পার্লামেন্টারি শাসন ব্যবস্থাকে অকার্যকর করাই ফ্যাসিস্ট দলের কর্মসূচী। ১৯২২ সালে ফ্যাসিস্ট বাহিনীর ভয়ে ভীত রাজা ইমান্যুয়েল মুসোলিনীকেই প্রধানমন্ত্রী পদে বরণ করে নিলেন।

ফ্যাসিস্ট নায়ক মুসোলিনীর আমন্ত্রণেই রবীন্দ্রনাথ ১৯২৬ সালে সপরিবারে ও সপার্ষদে ইতালি পরিভ্রমণে যান। মুসোলিনীর 'ব্ল্যাক শার্ট' বাহিনী যখন নির্বিচারে সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্টদের খুন, খুন-জখম করছে, যখন দেশের অভ্যন্তরে পুনরায় যুদ্ধোন্মাদনা সৃষ্টি করছে, সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথের মতো একজন বিশ্বশান্তির দূতের ইতালি ভ্রমণ অনেককেই বিস্মিত করলো। ইউরোপের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়, এমনকি এদেশেও 'অমৃতবাজার', 'পাইওনিয়র' প্রভৃতি পত্রিকায় এই ঘটনায় সন্ধিহান হয়ে প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হলো। বিশেষ করে সমালোচনায় সরব হলো ব্রিটিশ পত্র-পত্রিকাগুলি। এমনকি রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার নামে, অতিরঞ্জিত সংবাদও প্রকাশিত হলো। এমনই একটি অতিরঞ্জিত সংবাদ প্রকাশিত হলো 'Sunday Chronicle' পত্রিকায়। লেখা হলো, 'Fascism is taking a grip on India. The cause is Italian propaganda, the object of which is obscure, but the results of which are incalculable." "Some months ago Sgr. Carlo Formichi an Italian Professor was sent, for some obscure reasons, to study Indian Philosophy at the Visvabharati Institute of Dr. Sir Rabindranath Tagore in Santiniketan of Bengal. ঐ প্রতিবেদনে আরও বলা হলো, অধ্যাপক ফর্মিকি বাংলা ও যুক্তপ্রদেশে কয়েকটি ফ্যাসিস্ট কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য ঐ দুই প্রদেশের জমিদার ও তালুকদারদের সাথে গোপন শলা করেছেন। প্রতিবেদনের এই অংশটি যে অতিরঞ্জিত এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ ইতালিয় অধ্যাপক নিশ্চিতভাবে কোনো অভিসন্ধি নিয়ে শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। কিন্তু বাংলা ও যুক্তপ্রদেশে ফ্যাসিস্ট কেন্দ্র গড়ে তোলার সংবাদটিতে কোনো সত্যতা ছিল না।

ব্রিটিশ সংবাদপত্রগুলির এই ধরনের ভিত্তিহীন, অসংযত মন্তব্যে অস্বস্তিতে পড়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তবে শুধুমাত্র ব্রিটিশ সংবাদপত্রই তাঁর সমালোচনা করেছিল তা নয়। সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভাইপো, আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদবিরোধী মঞ্চের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংগঠক সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরও ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক নীরবতায় আহত হয়েছিলেন। ১৯৩৩ সালের ১ নভেম্বর প্যারিস থেকে রবীন্দ্রনাথকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি বলেন, ''... প্যারিসের কালচারাল জীবনের বহু লোকের কাছ থেকে অনবরত শুনতে হয়েছে যে, সমস্ত পৃথিবীর এই দুঃসময়ে তুমি একেবারে চুপ করে আছ। পৃথিবীর সমস্ত দেশের মনীষীরা জোর গলায় তাঁদের মত জানিয়েছেন, শুধু তুমি চুপ করে আছ। গান্ধীর কাছ থেকে কেউ কিছু আশা করেনি, কিন্তু তোমার কাছ থেকে তারা প্রতিবাদ আশা করেছিল...।"

ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে রবীন্দ্রভাবনাকে কেন্দ্র করে ঘরে-বাইরে যখন এভাবেই সন্দেহ-শঙ্কা দানা বাঁধছে, তখন জুরিখে নিজ মত ব্যক্ত করলেন তিনি। অধ্যাপক সালভেদরি ও তাঁর স্ত্রীর সাথে আলাপচারিতায় রবীন্দ্রনাথ বললেন, "... In India the reports of Fascist atrocities reached me from time to time, and I had serious misgivings about coming back to Italy. About this time Professor Formichi came to Santiniketan, bringing with him from Mussolini, a wonderful gift of books and a valuable collection of art reproductions for my institution. He also brought an appreciatise letter from Mussolini himself... On my message to Mussolini I expressed my thanks to him for all this, but this was purely in connection with my own work, and had no reference to his political activities... at one time I had practically decided to give up my projected tour in Italy. However, I had my promise to fulfill. I also had a strong desire to meet and spend a few days with Romain Rolland and this seemed the last chance of doing so." ইতালি ভ্রমণকালে মুসোলিনীর সাথে রবীন্দ্রনাথের দুবার সাক্ষাৎ হয় এবং মুসোলিনীর অনুচররা কৌশলে সবকিছুই উপর উপর ঘুরে দেখায়। ফলে ফ্যাসিস্ট ইতালির আসল রূপ কবির চোখে ধরা পড়েনি।

চতুর মুসোলিনী রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা আদায় করার জন্য সাজিয়ে গুছিয়ে বাস্তবতা রহিত আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক চিত্র হাজির করলেন। সরল বিশ্বাসী কবি এটিকেই প্রকৃত ইতালি ধরে নিয়ে বললেন, "... I am glad of this opportunity to see for myself the work of one, who is assuredly a great man..." ইতালির ফ্যাসিস্ট পত্র-পত্রিকাগুলি রবীন্দ্রনাথের এই অসতর্ক মন্তব্যকে ব্যাপকহারে প্রচার করলো।

ইতালি সফর শেষে রবীন্দ্রনাথ যান সুইজারল্যান্ডে। সেখানেই রোমা রোঁলার সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। এখানে কবি প্রায় একপক্ষ কাল সময় কাটান এবং রোঁলা, জি ফ্রেজার, অধ্যাপক বোভেট প্রমুখের সাথে ফ্যাসিবাদসহ অন্যান্য বিষয় নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন। রোঁলাই প্রথম ফ্যাসিবাদের কদর্য রূপ কবির সামনে তুলে ধরেন। রোঁলা তাঁর 'I will not rest' পুস্তিকায় লিখেছেন, ''আমি রবীন্দ্রনাথের চোখ খুলিবার চেষ্টা করিলাম, এ চেষ্টা আমার পক্ষে খুব সহজ হয় নাই। ফ্যাসিজমের আসল রূপ আমি তাহার নিকট খুলিয়া ধরিলাম। ইহার হিংস্রনীতির কবলে যাহারা পড়িয়াছে তাহাদের সহিত তাহার সংযোগ সাধন ঘটাইলাম। রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে বিচলিত হইলেন।

''যে ফ্যাসিজম তখন তাঁহার নাম ভাঙাইতেছিল, তাহার সহিত তিনি খোলাখুলিভাবে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিলেন। ইতালিয় বন্ধুগণের এবং সি এফ এন্ড্রুজের নিকট লিখিত চিঠিতে তিনি তাঁহার মত পরিবর্তনের কথা ব্যক্ত করিলেন।"...

রোঁলার সাথে সাক্ষাতের পর রবীন্দ্রনাথ যান জুরিখে। সেখানে শ্রীমতি সালভেদোরি একে একে ফ্যাসিস্টদের নৃশংস হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের কাহিনী খুলে বলেন। তিনি বর্ণনা দেন কিভাবে এক রাতেই ফ্লোরেন্সে ১৮ জন ফ্যাসি বিরোধীদের হত্যা করা হয়। অনুতপ্ত কবি বলেন, "I wish I had known for certain the dark deeds, that were being done in Italy, then I would not have come to their country—I certainly would not..."

কিছুদিন পরে এন্ড্রুজকে লেখা একটি পত্র ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানে প্রকাশিত হয়। ঐ পত্রের এক জায়গায় তিনি লিখলেন, "... the methods and the principle of this Fascism concern all humanity, and it is absurd to imagine that I could ever support a movement which ruthlessly suppresses freedom of expression, enforces observances that are against individual conscience and walks through a blood stained path of violence..."

এক কথায় ফ্যাসিবাদের প্রকৃত চরিত্র জানার পর, মত পরিবর্তনে বিন্দুমাত্র বিলম্ব করেননি বিশ্বকবি।

উপসংহার ঃ অসহযোগ আন্দোলনকে খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করার ফলে, এর সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট মূল্যায়ন শুরু থেকেই ছিল। কিন্তু ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে সঠিক তথ্য তাঁর কাছে শুরুতে না থাকায় এই বিষয়ে তাঁর মূল্যায়ন পরিবর্তিত হয়েছে। এই স্থিরতা ও গতিময়তা রবীন্দ্রচিন্তার দুটি দিক। আপাত বৈপরীত্য সম্পন্ন এই দুটি বৈশিষ্ট্যের মূল উপাদান ছিল একটিই। তা হলো, মানব কল্যাণের প্রতি বিশ্বকবির দায়বদ্ধতা। □

দাবি আদায়ের লক্ষ্যে সংগ্রাম আন্দোলনই একমাত্র পথ

বিজয় শঙ্কর সিংহ

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি তার জন্মলগ্ন থেকে একমাত্র রাস্তাতে লড়াই সংগ্রাম করেই আর্থিক ও অধিকারগত দাবি অর্জন করেছে। দেশের ও রাজ্যের মধ্যবিত্ত কর্মচারী সমাজ ও শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে লড়াই সংগ্রাম করেছে। দেশের শাসক শ্রেণীর জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে যেমন সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে লড়াই করেছে, তেমনি রাজ্যের কর্মচারী ও শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে ধারাবাহিকভাবে সংগ্রাম করেছে। গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে শুরু করে, ষাট ও সত্তরের দশকজুড়ে কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা সহ একাধিক দাবিতে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করেছে আমাদের সংগঠন। সেই সময়ে সংগঠনের নেতৃবর্গকে গ্রেপ্তার ও বরখাস্ত করা হয়েছিল। সারা রাজ্যজুড়ে কর্মী-সংগঠক- নেতাদের ব্যাপক হারে অন্যায়ভাবে বদলী করা হয়েছিল। সর্বোপরি ৬০জন কর্মী-নেতৃত্বকে খুন করা হয়েছিল। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি এই নৃশংস আক্রমণকে মোকাবিলা ও ভয়ভীতিকে উপেক্ষা করেই কর্মচারী স্বার্থে লড়াই জারি রেখেছিল। সংগ্রাম আন্দোলন থেকে পিছু হঠেনি বা দাবি আদায়ের জন্য কোনো অপেক্ষাকৃত সহজ রাস্তার খোঁজ করেনি। আমাদের সংগঠনের পূর্বসূরী নেতৃত্ববৃন্দ মতাদর্শে অটুট আস্থা রেখে সাহসের সাথে কর্মচারী স্বার্থে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, যা আমাদের কাছে শিক্ষনীয়। সত্তরের দশকে আধা ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাসের সময় লড়াই সংগ্রামের রাস্তা থেকে সরে যান নি বা মহার্ঘভাতার মতো আর্থিক দাবি নিয়ে আইনের আশ্রয় নেওয়ার কথা কোনোদিন ভাবেননি। দৃঢ় প্রত্যয় সাহসের সাথে ধারাবাহিকভাবে মুখোমুখি প্রতিরোধ সংগ্রামে যুক্ত ছিলেন। তাঁদের নির্ভীক আত্মত্যাগ ভুলবার নয়।

১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রাজ্যের শ্রমজীবি মানুষ, মধ্যবিত্ত কর্মচারী সমাজ সর্বত্র গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরে পেয়েছিল। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ট্রেড ইউনিয়ন ও ধর্মঘট করার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রশাসনিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত অর্থাৎ গ্রামের সরকার এবং শহরাঞ্চলে ১২৭টি পৌরসভা ও কর্পোরেশন গঠন করা হয়েছিল। সর্বোপরি মত প্রকাশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পঞ্চায়েত, পৌরসভা ও কর্পোরেশন-এর মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষ সার্বিক পরিষেবা পেয়েছে এবং রাজ্যজুড়ে লক্ষ লক্ষ যুবক-যুবতীর কর্মসংস্থান হয়েছিল। কৃষিতে ব্যাপক উন্নতি হয়েছিল। বর্গা প্রথার আইনানুগ স্বীকৃতির ফলে ২৯ লক্ষ পরিবার উপকৃত হয়েছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রসার ঘটেছিল, সমাজের সব স্তরে অর্থনৈতিক উন্নতি হয়েছিল। শিক্ষক মহাশয়, সরকারী কর্মচারীরা যোগ্য সম্মান ও মর্যাদা পেয়েছিলেন। যা নজিরবিহীন ছিল। কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতার আইনী স্বীকৃতি পাওয়া গেছিল। বছরে দু কিস্তি মহার্ঘভাতা দেওয়া হতো, কোনো সময়ে তিন কিস্তিও পাওয়া গেছে। বামফ্রন্ট সরকারের একেবারে শেষপর্বে সেই সময়ে বকেয়া ১৬ শতাংশ মহার্ঘভাতার মধ্যে ১০ শতাংশের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ভোট অন অ্যাকাউন্টস বাজেটে বরাদ্দ ছিল। অর্থাৎ ৬ শতাংশ বকেয়া ছিল। ৪টি বেতন কমিশন কার্যকর হয়েছিল, স্বাস্থ্য, কৃষি শিল্প সর্বক্ষেত্র এক ধ্বংসাত্মক চেহারা নিয়েছে। মানুষের দুর্দশা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। পঞ্চায়েত, পৌরসভাসহ প্রশাসনে সর্বস্তরে ব্যাপক দুর্নীতি হচ্ছে।

বর্তমান করোনা মহামারী সংক্রমণের যেভাবে বৃদ্ধি ঘটছে

ভ্রমণভাতা চালু সহ একজন কর্মচারী ৩ বছর চাকরি সম্পূর্ণ করলেই পার্মানেন্ট হওয়ার আদেশনামা প্রকাশিত হয়েছিল। কর্মচারীদের জন্য ৮-১৬-২৫ ক্যারিয়ার এ্যাডভান্সমেন্ট স্কীম হয়েছে, যা কোনো রাজ্যে নেই। প্রশাসনের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ক্যাডারের সার্বিক সুযোগ সুবিধা সংক্রান্ত অসংখ্য আদেশনামা প্রকাশ করেছে। এছাড়া 'ওয়েস্ট বেঙ্গল সংক্রান্ত হেলথ স্কীম ২০০৮' নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত ও আমাদের সাফল্য। বামফ্রন্ট সরকারের সময়কালে অভূতপূর্ব সাফল্য আমরা পেয়েছি। যার অবশ্যই ভূ-ভারতে কোনো নজির নেই।

২০১১ সালে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার আসার পর রাজ্যের গণতন্ত্র আক্রান্ত ও বিপন্ন। সারা রাজ্যজুড়ে সন্ত্রাস ও লুম্পেন রাজ চলছে। ট্রেড ইউনিয়ন ও ধর্মঘটের অধিকার আক্রান্ত। রাজ্যের সাধারণ মানুষ ও প্রশাসনের অভ্যন্তরে কর্মচারী সমাজ আজ আক্রান্ত। এছাড়া বামফ্রন্ট সরকারের ৩৪ বছরে সমাজের সর্বস্তরে ও প্রশাসনের অভ্যন্তরে যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা আজ ধূলায় লুণ্ঠিত।

এরকম একটা ভয়ঙ্কর অসহনীয় পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে সাধারণ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে রাজ্যে একমাত্র বামপন্থীরা ধারাবাহিকভাবে, লড়াই সংগ্রাম সংগঠিত করছে। রাজ্যে শিক্ষা, তাতে সরকারের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর কঙ্কালসাড় চেহারা প্রকাশ পেয়েছে। আমফান ঝড়ে বিপন্ন মানুষের জন্য ত্রাণ বণ্টন নিয়ে ব্যাপক দুর্নীতি প্রকাশ পেয়েছে।

এরকম একটা পরিস্থিতিতে আমরা বলেছি প্রশাসনিক ও সামাজিক দায়িত্ব পালনে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অতীত ঐতিহ্যকে সামনে রেখে মানুষের পাশে, মানুষের সাথে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সংগঠন কলকাতা সহ সারা রাজ্যেজুড়ে প্রায় ১৮০০০ প্রান্তিক অসহায় মানুষকে ত্রাণ দিয়েছে ও ১২০০০ মানুষকে কমিউনিটি কিচেন করে রান্না করা খাবার খাইয়েছে।

আমাদের কর্মচারী ও প্রবীণ অবসরপ্রাপ্তরা রাজ্য সরকারের পাহাড় প্রমাণ আর্থিক বঞ্চনা সত্ত্বেও, অসুবিধার মধ্যে থেকেও সংগঠনের অতীত ঐতিহ্যকে বহন করে করোনা মহামারী ও আমফান-এ আক্রান্ত অসহায় মানুষের জন্য সংগঠনের আহ্বানে যেভাবে সাড়া দিয়েছেন তা অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য।

এছাড়া ২০১১ সালের পর থেকে আমরা আর্থিক ও অধিকারগত বঞ্চনার প্রতিবাদে ধারাবাহিক আন্দোলন সংগ্রাম করেছি। দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে অর্জিত অধিকার কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা বর্তমান রাজ্য সরকার দিতে অস্বীকার করেছে। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ৪টি বেতন কমিশনের বর্ধিত বেতন আমরা পেয়েছি। আর বর্তমান সরকার মহার্ঘভাতা বিহীন, এরিয়ার ছাড়া বেতন কমিশন দিয়েছে। বাড়ি ভাড়া ভাতা কমিয়ে দিয়েছে। বর্তমানে (১৭+৪) = ২১ শতাংশ মহার্ঘভাতা বকেয়া। সারা ভারতবর্ষে কোথাও বকেয়া নেই। লক্ষাধিক পদ শূন্য। চুক্তির স্থায়ী নিয়োগের পরিবর্তে এজেন্সি প্রথায় ৫০০০, ৭০০০ ও ১০,০০০ টাকা বেতনে নিয়োগ, চলছে। যা যুব সমাজের প্রতি চরম বঞ্চনা।

২০১১ সালের পর থেকে ধারাবাহিকভাবে আমরা আন্দোলন করছি। তিনবার নবান্ন ও বিকাশ ভবন অভিযান, একাধিক মিছিল বিক্ষোভ হয়েছে। সরকার বাধ্য হয়েছে সংগঠনের সাথে আলোচনা করতে। আমাদের নেতৃত্ব কর্মীদের নামে এফ আই আর করা হয়েছে। ঐতিহাসিক নবান্ন অভিযানে আমাদের গ্রেপ্তার করার পর দার্জিলিং, কালিম্পং ও মুর্শিদাবাদে বদলী করা হয়েছে। প্রায় দু'বছর সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক, সহ-সম্পাদকদ্বয়, কোষাধ্যক্ষ সহ একাধিক সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যকে দূরবর্তী জেলায় বদলী সত্ত্বেও সংগঠন পরিচালনাসহ ধারাবাহিকভাবে বকেয়া মহার্ঘভাতা, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার, ধর্মঘটের অধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা প্রভৃতির বিরুদ্ধে রাজ্যের সাধারণ মানুষের স্বার্থে লড়াই সংগ্রাম চলছে। এমনকি দু'বার দু'দিনের ধর্মঘট হয়েছে। সরকারকে চ্যালেঞ্জ করেই ধর্মঘটীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমরা যখন ২০১১ সালের পর থেকে কর্মচারী সমাজ ও তার নিয়ে রাস্তাতে লড়াই সংগ্রাম জারি রেখেছি, আক্রান্ত হচ্ছি এবং একাধিকবার ডায়াস নন ও বেতন কাটা সত্ত্বেও ধর্মঘট করেছি, তখন আন্দোলনের মূল স্রোত থেকে কর্মচারী সমাজকে বিমুখ করার লক্ষ্যেই কেউ কেউ ধর্মঘট ও রাস্তার লড়াই থেকে সরে গিয়ে SAT-এ মামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

মামলা যে কেউ করতে পারেন, কিন্তু আমরা জানি যখন মালিক বা সরকার কেউ কথা শোনে না, তখন শ্রমিকশ্রেণী বাধ্য হয়ে সংগ্রাম আন্দোলনের শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করে। পৃথিবীতে এমন কোনো ট্রেড ইউনিয়ন খুঁজে পাওয়া যাবে না, যারা ধর্মঘট করে না। তাহলে সেই ট্রেড ইউনিয়ন-এর সংগ্রামী সত্ত্বা থাকতে পারে না। আমাদের সংগঠন ৬০-এর দশক থেকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, কোনো আইনী লড়াই-এর পথে না গিয়ে কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতার দাবি অর্জন করেছিল। আমাদের সংগঠন মতাদর্শ সম্পৃক্ত আন্দোলনের উপর অটুট বিশ্বাস রাখার ফলেই আর্থিক দাবি নিয়ে কোনোদিন আইনের আশ্রয় নেয়নি।

২০১১ সালের পর থেকে সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্টে প্রায় দু'ডজন মামলাতে রাজ্য সরকার হেরেছে বা কখনও জরিমানা হয়েছে। সারা দুনিয়া লক্ষ্য করেছে বর্তমান রাজ্য সরকার কোনো পরোয়া করেনি। অর্থাৎ এই সরকার আইন-কানুন, সংবিধান কিছু মানে না। অল ইন্ডিয়া প্রাইস ইনডেক্স অনুযায়ী দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য বেতনের যে ক্ষয় হয়, তা পূরণ করতে কেন্দ্রীয় সরকার মহার্ঘভাতা ঘোষণা করে এবং রাজ্য সরকারগুলি অনুরূপভাবে মহার্ঘভাতা ঘোষণা করে। অর্থাৎ মহার্ঘভাতা কর্মচারীদের আইনি অধিকার, দয়ার দান নয়। বামফ্রন্ট সরকার মহার্ঘভাতাকে আইনি স্বীকৃতি দিয়েছিল। আদালত মহার্ঘভাতার আইনী ন্যায্যতার যে কথা বলেছে, তা কোনো নতুন বিষয় নয়। কর্মচারী সমাজ জানে আইনি অধিকারের স্বীকৃতি বামফ্রন্ট সরকার দিয়ে গেছে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে বর্তমান সরকারকে তা নতুন করে শেখাতে হচ্ছে। আমরা মনে করি মহার্ঘভাতার দাবি নিয়ে মামলা করার অর্থ হলো কর্মচারীদের মনে সংগ্রাম আন্দোলনের মূল স্রোতে অংশগ্রহণ সম্পর্কে নিরুৎসাহ সৃষ্টি করা। তাই আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। এবং সংগ্রাম আন্দোলনই যে একমাত্র রাস্তা তার প্রচার করতে হবে।

এটা ঠিক প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আন্দোলন সংগ্রামের ঝুঁকি না পোহাতে চাইলে, আইনী লড়াই একটা সুবিধাজনক পথ। তাই কেউ মামলা করতে পারেন এবং পরে SAT, হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিতে পারে। কিন্তু যারা মামলা করেছে আশাকরি তারাও জানেন বিচার ব্যবস্থা দাবির স্বীকৃতি দিতে পারে, আদায় করে দিতে পারে না। এই দাবি আদায় করতে হলে তাই ধারাবাহিক সংগ্রাম আন্দোলনই একমাত্র পথ যা সরকারকে বাধ্য করবে। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে যারা রোজ দিনের পর দিন সরকারকে ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত করার লক্ষ্যে মহাকরণের অভ্যন্তরে চূড়ান্ত ন্যাক্কারজনক বিশৃঙ্খল আন্দোলন করেছিল, তারা এখন আন্দোলন বিমুখ কেন? কর্মচারী সমাজ বলছে, এরা কোথায় গেল? গ্রেপ্তার, বদলীর ভয়ে আন্দোলন বিমুখ হয়ে গেল নাকি? এই সময়ে ওদের কারোর গ্রেপ্তার, বদলী কিছুই হয়নি। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে পুলিশি আক্রমণ, এফআইআর, বরখাস্ত বা বদলী হওয়ার ভয় ছিল না। তাই আন্দোলন করেছিল। কর্মচারী সমাজ জানতে চায় এখন এরা কোথায়?

তাই আন্দোলন সংগ্রাম বিমুখ করার প্রয়াসকে ব্যর্থ করে দাবি আদায়ে সরকারকে বাধ্য করতে হলে রাস্তাতে ধারাবাহিকভাবে লড়াই সংগ্রাম করতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। প্রয়োজনে দলমত নির্বিশেষে সব অংশের কর্মচারীদের নিয়ে বর্তমান করোনা মহামারী সংক্রমণ-এর বিপদ থেকে মানুষকে রক্ষা করার সংগঠনের আহ্বান ও প্রশাসনিক সামাজিক দায়িত্ব পালনে রত থেকেই ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই সংগ্রাম জারি রাখতে হবে। আমাদের সামনে লড়াই ছাড়া শর্টকাট কোনো পথ নেই। এ কথা কর্মচারীদের কাছে দৃঢ়তার সাথে প্রচার করতে হবে। সারা বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের ইতিহাস তাই বলে। তাই আগামী দিনে বকেয়া ২১ শতাংশ মহার্ঘভাতা ও পাহাড় প্রমাণ আর্থিক ও অধিকারগত বঞ্চনার প্রতিবাদে অবশ্যম্ভাবী লড়াইতে সব অংশের কর্মচারী সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করেই, কর্মচারী স্বার্থবিরোধী সরকারের বিরুদ্ধে সরাসরি সংঘাতে যাওয়ার প্রস্তুতি গড়ে তুলতে হবে। □

খাদের কিনারায় ‘মোদিনমিক্স’

সঙ্কটটা শুরু হয়েছিল বহু আগে থেকেই। তখন চীনের ইউহান থেকে করোনা সংক্রমণের প্রাথমিক খবরটুকুও আসেনি। একটি দেশের অর্থনীতির স্বাস্থ্য পরিমাপক প্রতিটি সূচকরেই নিম্নগামী প্রবণতা সেই সময় থেকেই একটা স্থায়ী চেহারা গ্রহণ করছিল। সরকার নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন পরিসংখ্যান সংস্থার পক্ষ থেকে প্রকাশিত তথ্যে যখন অর্থনীতির ভঙ্গুর চেহারাটা ধরা পড়ে যাচ্ছিল, তখন সেই সময় তথ্য প্রকাশের ওপরেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হলো। স্মরণ করা দরকার, বেকারির হার গত ৪৫ বছরে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছিল করোনা সংক্রমণ শুরু হওয়ার আগেই। মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে সম্পদ পুঞ্জীভূত হওয়া এবং সমাজের অভ্যন্তরে তীব্র বৈষম্য ‘করোনা’র অবদান নয়। এক শতাংশ মানুষের হাতে দেশের মোট সম্পদের ৭০ শতাংশ চলে যাওয়াও করোনার আগমন বা লকডাউনের বাঁশি বাজার আগেই। ফলে কোভিড-১৯ এবং তদ্‌জনিত লকডাউনের কারণেই অর্থনীতি তার গতি হারিয়েছে, আর্থিক বৃদ্ধির হার কমেছে ইত্যাদি যে বক্তব্য কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে তা সঠিক নয়। অর্থমন্ত্রী কথিত দৈবদুর্বিপাক বা ‘অ্যাক্ট অফ গড’ নিতান্তই নিজেদের কুকর্মকে আড়াল করার অজুহাত মাত্র।

ধুঁকতে থাকা অর্থনীতি অপরিকল্পিত দীর্ঘমেয়াদি লকডাউনের ধাক্কা আর সামলাতে পারেনি। ফলে লকডাউন চলাকালীন কার্যত ধস্ নেমেছিল। আনলক প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর, যুদ্ধকালীন তৎপরতায় খাদের কিনারা থেকে টেনে তোলার জন্য যা করা প্রয়োজন বলে বহু বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ মত দিয়েছিলেন, তাতে কর্ণপাত করেনি কেন্দ্রীয় সরকার। লকডাউনের সময় অর্থনীতির সাধারণ সঙ্কট যে ক্রনিক আকার ধারণ করেছিল, তার মূল কারণ চাহিদার অভাব। মানুষের হাতে কাজ না থাকার ফলেই তৈরি হয়েছিল এই চাহিদার অভাব। ফলস্বরূপ, এর থেকে বেড়িয়ে আসার জন্য প্রয়োজন ছিল সরকারী খরচ বৃদ্ধি করে অর্থনীতিতে চাহিদা সৃষ্টি। বামপন্থী দলগুলির পক্ষ থেকে দুটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল---(১) আয়কর দেন না এমন প্রতিটি পরিবারের কাছে মাস ১০ কেজি করে খাদ্যশস্য (চাল / গম) বিনামূল্যে পৌঁছে দেওয়া এবং (২) ঐ পরিবারগুলিকেই অন্তত ৬ মাস মাসে ৭,৫০০ টাকার আর্থিক সাহায্য। গরিব, নিম্নবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষ যা আয় করে, তার সিংহভাগই তারা ভোগ্যপণ্য ক্রয় করার জন্য ব্যয় করে। তাই তাদের হাতে সরকার সামরিকভাবে হলেও কিছু নগদ অর্থ পৌঁছে দিলে, বাজারে চাহিদা সৃষ্টি হতো। যার মধ্য দিয়ে স্তব্ধ অর্থনীতির চাকাটাও গড়াতে শুরু করতে। শুধুমাত্র বামপন্থীরাই নন, বহু অবামপন্থী অর্থনীতিবিদও এই ‘কেইনসীয়’ রাস্তা অনুসরণের পরামর্শ সরকারকে দিয়েছিল। কিন্তু আন্তর্জাতিক লগ্নীপুঁজির দাস কেন্দ্রীয় সরকার সরকারী খরচ বৃদ্ধির রাস্তায় হাঁটেনি। কারণ সরকারের খরচ বৃদ্ধি করে, আর্থিক ঘাটতি বৃদ্ধি আন্তর্জাতিক লগ্নীপুঁজির না পসন্দ।

দেশের অর্থনীতির হাল ফেরানোর এই রাস্তায় না হেঁটে, বহু ঢক্কা-নিনাদ সহকারে যে ২০ লক্ষ কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষণা করা হলো, তাতে চাহিদা বৃদ্ধির দিকে নজর না দিয়ে, শিল্পদ্যোগীদের বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদানের জন্য বিভিন্ন ধরনের ঋণ ও ছাড়ের ব্যবস্থা করা হলো। কিন্তু বাজার ঝিমিয়ে থাকলে, চাহিদা সৃষ্টি না হলে শিল্পপতিরা বিনিয়োগে উৎসাহী হবে কেন? এই সহজ প্রশ্নের উত্তর প্রধানমন্ত্রী বা অর্থমন্ত্রী দেননি। ফল যা হওয়ার তাই হয়েছে। আনলক প্রক্রিয়া চতুর্থ দফায় পৌঁছে গেলেও, দেশের অর্থনীতি সুস্থ হওয়া তো দূরের কথা, আই সি ইউ থেকে জেনারেল বেডেও স্থানান্তরিত করা সম্ভব হয়নি। যার প্রমাণ মিলছে সরকারী পরিসংখ্যানেই। বর্তমান আর্থিক বছরের প্রথম ত্রৈমাসিকে (এপ্রিল-জুন) মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের সঙ্কোচন হয়েছে (–) ২৩.৯ শতাংশ। এন এস ও-র রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, মোট মূল্য যুক্ত (Gross Value Added) হবার হার সঙ্কুচিত হয়েছে (–) ২২.৮ শতাংশ। শিল্প ক্ষেত্রে সঙ্কোচন (–) ৩৮ শতাংশ, ম্যানুফ্যাকচারিং-এ (–) ৩৯.৩ শতাংশ, পরিষেবায় সঙ্কোচন (–) ২২.৬ শতাংশ, বাণিজ্য ক্ষেত্রে (–) ৪৭ শতাংশ, নির্মাণ ক্ষেত্রে (–) ৫০.৩ শতাংশ।

মহামারি ও লকডাউনের ধাক্কায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশেই অর্থনীতিতে সঙ্কোচন দেখা গেলেও, ভারতে এই হার সর্বাধিক। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদদের ধাররঅ হলো, জি ডি পি-র এই সঙ্কোচনও প্রকৃত চিত্র নয়। কখন এই হিসেব মূলত সংগঠিত ক্ষেত্রের ওপর ভিত্তি করে। অসংগঠিত ক্ষেত্রে, যেখানে কার্যত ধস্ নেমেছে, তা হিসেবে নিলে সঙ্কোচনের চেহারা হবে আরও খারাপ। আবার জি ডি পি-র সঙ্কোচন যে হারে ঘটেছে, তার থেকে অধিকতর সঙ্কোচন ঘটেছে মজুরির ক্ষেত্রে। লকডাউনের কারণে যাঁরা জীবিকা হারালেন (মোট শ্রমজীবীদের ৮০ শতাংশ) তাদের কোনো ক্ষতিপূরণ না দেওয়ার ফলে, একদিকে যেমন তাঁরা দারিদ্রের অন্ধকারে তলিয়ে গেলেন, তেমনই প্রয়োজনীয় খাবার না কিনতে পারার কারণে অপুষ্টির শিকার হলেন। অপুষ্ট শরীরে করোনা সংক্রমণের আশঙ্কাও বৃদ্ধি পেল। অর্থাৎ বর্তমানে সংক্রমণের হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ারও অন্যতম কারণ তীব্র আর্থিক সঙ্কট। এই যখন পরিস্থিতি তখন দেশের সরকার সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকাকে রক্ষা না করে, দেশের সম্পদকে জলের দরে দেশি-বিদেশী বেসরকারী পুঁজির হাতে তুলে দিচ্ছে। অর্থনীতিকে খাদ থেকে টেনে তোলার থেকেও সরকারের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মন্দিরের শিলান্যাস। সত্য সেলুকাস, এর নামই আত্মনির্ভর ভারত। □

ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষক সংগঠনের ‘ভারত বাঁচাও’ কর্মসূচী

গত ৯ আগস্ট, রবিবার স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহাসিক ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলনের দিনটিতে সারা দেশজুড়ে ঐক্যবদ্ধভাবে ‘ভারত বাঁচাও দিবস’ পালন করেন ১ কোটিরও বেশি শ্রমজীবী। কর্পোরেটদের হাতে দেশের মহামূল্যবান সম্পদ বেচে দেওয়ার বিরুদ্ধে এবং করোনা মহামারীতে দেশবাসীর জীবন ও জীবিকা রক্ষার দাবিতে দেশের ১ লক্ষেরও বেশি জায়গায় পালন করা হয় এই কর্মসূচী। কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির জাতীয় মঞ্চ এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের ইউনিয়ন ও ফেডারেশনগুলির ডাকে সত্যাগ্রহ, জেল ভরো, মিছিল, জনসভা ইত্যাদির মাধ্যমে কেন্দ্রের মোদী সরকারকে হুঁশিয়ারি দেন শ্রমজীবী মানুষ। শ্রমিক-কর্মচারীদের সাথে সাথে এই বিক্ষোভে ব্যাপক সংখ্যায় যোগদান করেছিলেন কৃষক ও খেতমজুররাও। এই বিক্ষোভে মহিলা, ছাত্র, যুব, বস্তিবাসী, শিক্ষক, শিল্পী, আইনজীবী ও চিকিৎসকদের অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে সমাজের সর্বস্তরে সাধারণ মানুষের গণঅসন্তোষকে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। এই কর্মসূচী আগামীদিনের ঐক্যবদ্ধ শ্রমজীবী আন্দোলনের ভিতকে আরও জোরালো করবে।

কেন্দ্রের মোদী সরকারের দেশবিরোধী, জনবিরোধী, শ্রমিক বিরোধী ও কৃষক বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে ওইদিন সারা দেশজুড়ে করোনাজনিত স্বাস্থ্যবিধি মেনেই বিভিন্ন কলকারখানার গেট, কর্মস্থল, শ্রমিক সংগঠনের অফিস ও রাজপথে জড়ো হন শ্রমজীবী মানুষ। দিনভর চলতে থাকে প্রতিবাদের নানা কর্মসূচী। অন্ধ্র প্রদেশ, বিহার, দিল্লি, ছত্তিশগড়, গুজরাট, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, জম্মু-কাশ্মীর, কেরালা, মহারাষ্ট্র, মধ্য প্রদেশ, ওড়িশা, পাঞ্জাব, রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সহ বিভিন্ন রাজ্যে এই কর্মসূচীতে ভালো সাড়া মেলে। বহু আন্দোলনকারীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ত্রিপুরার আগরতলায় মহিলাদের সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ওপরে হামলা চালিয়ে বেপরোয়া ধরপাকড় করে পুলিশ। দিল্লিতে যন্তর মন্তরে আন্দোলনকারী সংগঠনগুলির ডাকে এক সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সি আই টি ইউ-র সাধারণ সম্পাদক তপন সেন, এ আই টি ইউ সি-র সাধারণ সম্পাদক অমরজিৎ কাউর, আই এন টি ইউ সি-র সহসভাপতি অশোক সিং, এ আই ইউ টি ইউ সি-র জাতীয় সম্পাদক আর কে শর্মা, এল পি এফ-র জওহর সিং, এ আই সি সি টি ইউ-র রাজীব ডিমরি, এ আই কে এস সি সি-র আহ্বায়ক ভি এম সিং প্রমুখ। এছাড়াও আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন সি আই টি ইউ-র সভাপতি কে হেমলতা, সারা ভারত কৃষক সভার সাধারণ সম্পাদক হান্নান মোল্লা, সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সাধারণ সম্পাদক মরিয়ম ধাওয়ালে, শ্রমিক নেতা এম এল মালকোটিয়া, জে এস মজুমদার, এস দেবরায়, এ আর সিন্ধু, অমিতাভ গুহ, কৃষক নেতা বিজু কৃষ্ণাণ, পি কৃষ্ণপ্রসাদ প্রমুখ। ব্যাঙ্ক, বিমা, প্রতিরক্ষা, রেল, পেট্রোলিয়াম, বিদ্যুৎ, পোস্টাল, টেলিকমের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রের কর্মচারীরা ছাড়াও ধর্মঘটী ‘আশা’ কর্মীরা বিপুল সংখ্যায় অংশগ্রহণ করেন যন্তর মন্তরের প্রতিবাদ কর্মসূচীতে। মোদী সরকারের জনবিরোধী নীতির তীব্র বিরোধিতা করে আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ বলেন, দেশের একের পর এক রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প-কারখানা, কয়লা ব্লক, রেল, এয়ার ইন্ডিয়া, প্রতিরক্ষা, ব্যাঙ্ক, বিমা, আর্থিক ক্ষেত্র, টেলিকম কর্পোরেটদের কাছে বেচে দেওয়ার ছক কষছে কেন্দ্রের বি জে পি সরকার। মুখে ‘আত্মনির্ভর ভারত’-এর মতো গালভরা কথা বলে সাম্প্রতিক করোনা মহামারীর সুযোগে এই আক্রমণ বহুগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। শ্রমিকরা হয় কাজ হারাচ্ছেন, নয়তো তাঁদের বেতন ছেঁটে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে। গ্রাম-শহরে ক্ষুধা, অপুষ্টি, অবসাদজনিত আত্মহত্যা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অপরিকল্পিত লকডাউনের মতো পদক্ষেপে শ্রমজীবী মানুষের দুর্দশা চরমে উঠেছে। কোটি কোটি শ্রমিক, কৃষক, খেতমজুর, সাধারণ কর্মীদের সর্বনাশ করে এই সরকার শুধু কর্পোরেট এবং বৃহৎ ব্যবসায়ীদের মুনাফা সুনিশ্চিত করার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে। এই পরিস্থিতির পরিবর্তনের জন্যে দেশ জুড়ে আরও বড়ো ও আরও ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলনের আহ্বান জানান নেতৃবৃন্দ। প্রসঙ্গত উল্লেক্য, সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের আহ্বানে, বিভিন্ন প্রদেশের রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা ‘ভারত বাঁচাও কর্মসূচী পালন করে ১০ আগস্ট তারিখে (৯ আগস্ট ছিল ছুটির দিন)। পশ্চিমবঙ্গেও এই কর্মসূচী পালিত হয়, যার রিপোর্ট পৃথকভাবে প্রকাশ করা হলো। □

ইন্দ্রজিৎ রায়চৌধুরী

তৃতীয় পৃষ্ঠার পরে

জাতীয় শিক্ষানীতি ঃ ভারতের পশ্চাদমুখী উল্লম্ফন

দর্শন হতে পারে, কিন্তু এটিকেই যদি পাঠক্রমের মাধ্যমে সমস্ত ছাত্রের কাছে গ্রহণযোগ্য করার চেষ্টা করা হয়, তার অপরিহার্য পরিণাম হবে শোষণ প্রক্রিয়াকে লঘু করে দেখা; যদি একজন কারখানার শ্রমিকের ছেলেকে শেখানো হয় যে, ‘নিষ্কাম কর্মই’ জীবনের আদর্শ, তাহলে সেই ছেলেটির বাবা যখন মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে ধর্মঘটে যাবে, তার প্রতি ছেলেটির কার্যত কোনো সহানুভূতিই থাকবে না।

শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ উন্নততর বিশ্ব গড়ে তোলা এবং এর জন্য প্রয়োজন বর্তমান ব্যবস্থা সম্পর্কে অসহিষ্ণুতা তৈরি করা। কিন্তু, যদি দেখা যায় যে বর্তমান ব্যবস্থার সাথেই মানিয়ে নিতে শেখানো হচ্ছে, অথবা আরও খারাপ হলো, অতীতের অবস্থা, যা থেকে মানুষ সক্রিয় উদ্যোগের মাধ্যমে বেড়িয়ে আসছে, তাকেই আদর্শ ব্যবস্থা হিসেবে হাজির করা হচ্ছে, তাহলে তা শিক্ষাক্ষেত্রে একটি প্রতিক্রিয়াশীল প্রকল্প। নয়া শিক্ষানীতি এমনই একটি প্রতিক্রিয়াশীল প্রকল্প হাজির করেছে। এর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে আরও একটি বিষয়ের মধ্য দিয়ে, তা হলো ছাত্রদের মৌলিক অধিকার সম্পর্কে কিছুই শোখানো হবে না। শুধু শেখানো হবে মৌলিক কর্তব্য। দলিলের প্রায় সর্বত্রই প্রচলিত ব্যবস্থা সম্পর্কে এক ধরনের সম্মতি নির্মাণের কথা বলা হয়েছে। অভিজাত সম্প্রদায়ের সন্তানেরা বিভিন্ন প্রশাসনিক পদে বসে আন্তর্জাতিক লগ্নীপুঁজির সমর্থকের ভূমিকা পালন করবে, আর সমাজের ব্রাত্য অংশের সন্তানেরা, সামাজিক ও আর্থিক দিক থেকে বঞ্চিত যারা, তারা হবে শ্রমিক শ্রেণীর স্থায়ী সদস্য, যাদের সামনে কর্মসংস্থানের সুযোগ ক্রমান্বয়ে সঙ্কুচিত হবে, কিন্তু এই প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে কার্যকরী লড়াই করার মতো ধারালো বোধই তাদের থাকবে না। এটা যে কোনো দেশের শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি ভ্রান্ত দর্শন, বিশেষ করে আমাদের মতো দেশে তো বটেই।

নমনীয়তা, অন্তর্ভুক্তিকরণ, ছাত্রদের বোঝা কমানো ইত্যাদির কথা বলে, আসলে ঠিক বিপরীতটাই করা হচ্ছে ঃ বাতিল করে দেওয়া এবং বাতিল করার প্রক্রিয়াটিকেই স্বাভাবিক বলে প্রতিপন্ন করা।

অন্যদিক থেকে বোঝার চেষ্টা করলেই, নয়া শিক্ষানীতির প্রকৃত উদ্দেশ্যটা বোঝা যাবে। মানুষের চলমানতা প্রয়োজন বলেই, পুঁজিবাদ সমচরিত্রের জনশিক্ষা চালু করতে চায়। সামন্ত যুগে এই প্রয়োজন ছিল না, কারণ তখন মানুষ খুব কমই গ্রাম বা নিজের অঞ্চল ছেড়ে বেরোতো। পুঁজিবাদের এখনও এমন এক ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা দরকার যার মাধ্যমে তার প্রয়োজন অনুযায়ী শ্রমের যোগান পাওয়া যাবে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে শিক্ষার লক্ষ্য অনেক বৃহত্তর, যাকে বলা হয় ‘সর্বজনীন শিক্ষা’, যা আমাদের দেশে স্বাধীনতার পর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। আজকেও পুঁজিবাদের চাহিদা কিন্তু তা নয়। সুতরাং নয়া উদারবাদী পুঁজিবাদের জমানায় শিক্ষানীতির লক্ষ্য হলো, পুঁজির চাহিদা অনুযায়ী মানুষকে শিক্ষা দেওয়া এবং সর্বজনীন শিক্ষার প্রতিশ্রুতিকে বিভিন্ন কৌশলের সাহায্যে প্রথমে এড়িয়ে গিয়ে, পরবর্তী পর্যায়ে একে পরিত্যাগ করা। জাতীয় শিক্ষানীতিকে আরও ভালোভাবে বোঝা যাবে যদি, এই নীতিতে কী বলা হয়েছে তার প্রতি নজর না দিয়ে, এর বিভিন্ন প্রসঙ্গকে এড়িয়ে যাওয়ার কৌশল এবং কোন্ কোন্ বিষয়কে বর্জন করা হল, তার প্রতি নজর দেওয়া হয়। □

অনুবাদ ঃ সুমিত ভট্টাচার্য

প্রথম পৃষ্ঠার পরে

‘ভারত বাঁচাও’ কর্মসূচীতে শামিল রাজ্য কর্মচারীরা

ও সামাজিক সুরক্ষা, প্রতিটি সরকারী দপ্তরের নিয়মিত ম্যানিটাইজেশন, যাতায়াতের সুবিধার্থে পর্যাপ্ত পরিবহন ব্যবস্থা এবং করোনা চিকিৎসার বিষয়টিকে ওয়েস্ট বেঙ্গল হেল্‌থ্ স্কীমের অন্তর্ভুক্তিকরণ প্রভৃতি দাবিকে যুক্ত করে রাজ্যের উত্তরে পাহাড় থেকে দক্ষিণে সুন্দরবন পর্যন্ত বিস্তৃত বিভিন্ন জেলার সদরে ‘ভারত বাঁচাও’ কর্মসূচীতে শামিল হলেন রাজ্য কর্মচারীরা। বর্তমান স্বাস্থ্য বিধি মেনে দাবি সম্বলিত পোস্টার বুকে লাগিয়ে টিফিন বিরতিতে এই কর্মসূচী অন্যান্য জেলার সাথে কলকাতার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ভবনের সামনেও অনুষ্ঠিত হয়। মহাকরণ, নব মহাকরণ, খাদ্যভবন, বিকাশ ভবন, স্বাস্থ্য ভবন, বাণিজ্য কর ভবন প্রভৃতি স্থানে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সত্ত্বেও কর্মচারীদের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিংহকে দু’বছর আগে আরও কয়েকজন নেতৃত্বের সাথে প্রতিহিংসামূলক বদলি করা হয়েছিল দার্জিলিং জেলার বিজনবাড়িতে অবস্থিত পুলবাজার ব্লকে। ‘আনলক’ প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পরে তিনি কলকাতা থেকে কাজে যোগদানের জন্য পুলবাজারে ফিরে গেলে তাকে সরকারী নির্দেশিকা অনুযায়ী কোয়েরান্টাইননে পাঠানো হয়েছে। কোয়েরান্টাইন সেন্টারেই তিনি এককভাবে ঐ কর্মসূচীতে শামিল হন। □

ওয়েস্ট বেঙ্গল নন-মেডিকেল টেকনিক্যাল এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশনের ২৬তম রাজ্য সম্মেলন ৪-৫ জানুয়ারি ২০২০, বাঁকুড়া শহরে সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রথম দিন শুরুতে একটি বর্ণাঢ্য মিছিল বাঁকুড়া শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে সম্মেলন স্থলে উপস্থিত হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ, সম্মেলন উপলক্ষ্যে বাঁকুড়া শহরের নামকরণ করা হয়েছিল কমরেড বিমল দে নগর-এর স্থানীয় ধর্মশালার সম্মেলন মঞ্চের নামকরণ করা হয়েছিল কমরেড অনিল ভৌমিক মঞ্চ। কমরেড বিমল দে ছিলেন সংগঠনের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক এবং কমরেড অনিল ভৌমিক ছিলেন প্রাক্তন সংগঠন সম্পাদক। শহীদ বেদীতে মাল্যদান ও রক্ত পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের সূচনা হয়। স্বাগত ভাষণ দেন অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি তথা ১২ই জুলাই কমিটির অধ্যাপক যুগ্ম পঞ্চায়েত পার্থ ঘোষ। উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্যতম সহ-সম্পাদক দেবব্রত রায়। সম্মেলনে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন ও আয়-ব্যয়ের হিসেব পেশ করেন যথাক্রমে যুগ্ম-সম্পাদক বাপ্পা দাস ও কোষাধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দত্ত। একজন মহিলাসহ ২৬ জন প্রতিনিধি আলোচনা করেন। সমগ্র আলোচনার উপর জবাবী ভাষণ দেন বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক শান্তনু ভট্টাচার্য। সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিদের অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি অতনু মজুমদার ও সম্পাদক শুভময় ঘোষ হাজরা। সম্মেলন থেকে আগামী দু'বছরের জন্য সভাপতি রমেন মণ্ডল, সাধারণ সম্পাদক বাপ্পা দাস, যুগ্ম-সম্পাদক শক্তিপদ জানা, কোষাধ্যক্ষ গৌতম তপাদার, দপ্তর সম্পাদক নিলয় পাল চৌধুরী, মুখপত্র সম্পাদক শান্তনু ভট্টাচার্য ও মুখপত্র সহযোগী সম্পাদক হিসেবে অরুণ দে নির্বাচিত হন।

সম্মেলন উপলক্ষ্যে গঠিত প্রগতিশীল পুস্তক কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন জেলার কর্মচারী আন্দোলনের নেতা প্রণব মুখার্জী। মোট ১৮ হাজার টাকার বই বিক্রি হয়। সম্মেলন পরিচালনা করেন প্রশান্ত ঝা। গৌতম ঘোষ ও মানস কুমার বড়ুয়াকে নিয়ে গঠিত হয় সভাপতি মণ্ডলী। □

পশ্চিমবঙ্গ ওয়ার্ক এ্যাসিস্ট্যান্টস এ্যাসোসিয়েশনের ৬২তম দ্বি-বার্ষিক রাজ্য সম্মেলন গত ৮-৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ কমরেড অজয় মুখোপাধ্যায় নগরে (আলিপুরদুয়ার), কমরেড সঞ্জয় বসু মঞ্চে (ক্লাউড লাইন ভবনে) সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়।

এই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে কমরেড তরুন দাস প্রগতিশীল পুস্তক বিপণন কেন্দ্রের উদ্বোধন হয় ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২০। এই পুস্তক বিপণন কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী। এই অনুষ্ঠানের শেষে কেন্দ্রীয় শাসক শ্রেণীর স্বৈরাচারী পদক্ষেপের ফলে গৃহীত সি এ এ, এন আর সি, এন পি আর বিরোধী আন্দোলনের অংশ হিসাবে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ কর্মসূচীর সূচনা করেন বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী। এই সি এ এ, এন আর সি, এন পি আর বিরোধী গণস্বাক্ষর সংগ্রহের ক্যানভাসে উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দ সহ আলিপুরদুয়ার জেলার তিন শতাধিক কর্মচারী স্বাক্ষর করেন।

৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ সন্ধ্যায় সম্মেলন স্থলে আলিপুরদুয়ার জেলার চা বাগিচা এবং পাহাড়ি এলাকায় বসবাসকারী মানুষের বিশেষত রাভা, গাড়ো, নেপালী, আদিবাসী ও সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষের নিজস্ব কৃষ্টির মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপস্থিত প্রতিনিধি, কর্মচারী ও তাদের পরিবার পরিজনদের আপ্লুত করেছে।

৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ রাজ্য সম্মেলন শুরুর প্রাক্কালে বর্ণাঢ্য, সুসজ্জিত শ্লোগান মুখরিত মিছিল জেলা সদরের কিয়দংশ পরিক্রমা করে সম্মেলন মঞ্চে উপস্থিত হয়। এই মিছিলের অগ্রভাগে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, বেদীয়া ঝুমুর নৃত্য গোষ্ঠীর কলাকুশলীরা মাথায় পাগড়ি ও গলায় মাদল ঝুলিয়ে নৃত্য পরিবেশন।

সম্মেলনের শুরুতে রক্তপতাকা উত্তোলন করেন সমিতির সভাপতি ফাল্গুনী সরকার। শহীদ বেদীতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন সমিতির নেতৃত্ববৃন্দ, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি তথা উদ্বোধক আশীষ ভট্টাচার্য সহ বিভিন্ন নেতৃত্ব এবং বিভিন্ন গণসংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

৬২তম রাজ্য সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রতিনিধিরা ছাড়াও আলিপুরদুয়ার জেলার কর্মচারী ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন। সমিতির সভাপতি ফাল্গুনী সরকার ও সহসভাপতিত্রয় যথাক্রমে সত্যব্রত সরকার, বরুন মজুমদার ও সুকোমল সরকারকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী সম্মেলন পরিচালনা করেন। প্রথমেই অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি, আলিপুরদুয়ার পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অনিন্দ্য ভৌমিক, মুদ্রিত স্বাগত ভাষণ পাঠ করেন। সম্মেলনের উদ্বোধক রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি আশীষ ভট্টাচার্য অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় বর্তমান পরিস্থিতির বিভিন্ন ঘাতপ্রতিঘাত, পরিস্থিতির অভ্যন্তরে উদ্ভূত নেতিবাচক ও ইতিবাচক উপাদান সমূহকে বিশ্লেষণ করে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের সংগ্রাম আন্দোলনের অভিমুখ ও কর্তব্য সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জেলা ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক বলরাম কর। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী, এবিটিএ জেলা কমিটির পক্ষে কমলাক্ষ চন্দ, এবিপিটিএ জেলা কমিটির পক্ষে রঞ্জন দে, ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের জেলা কমিটির পক্ষে রতন ঘোষ, বিভাগীয় বীমা কর্মচারী সমিতির পক্ষে দীপঙ্কর দেবনাথ, ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক প্রাণতোষ ধর, অভ্যর্থনা কমিটির কার্যকরী সভাপতি শিউলী ঘোষ দত্ত এবং রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির জেলা সম্পাদক গোপাল ব্যানার্জী প্রমুখ।

প্রতিনিধি অধিবেশনে খসড়া সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন সমিতির অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক স্বরাজ চক্রবর্তী। আয় ও ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ জ্যোতির্ময় দাস, খসড়া প্রস্তাবাবলী পেশ করেন সংগঠন সম্পাদক প্রশান্ত ব্যানার্জী এবং স্মারক পত্রিকার সম্পাদক অমিতাভ চ্যাটার্জী। উত্থাপিত প্রতিবেদনের উপর ২০টি জেলার পক্ষ থেকে ২৩ জন প্রতিনিধি আলোচনা করেন। আলোচনান্তে জবাবী বক্তব্য পেশ করেন বিদায়ী কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে সাধারণ সম্পাদক সুব্রত কুমার গুহ। এই সম্মেলন মঞ্চে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন অভ্যর্থনা কমিটির কার্যকরী সভাপতি তথা জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রাক্তন সম্পাদক শিউলী ঘোষ দত্ত, বর্তমান সম্পাদক গোপাল ব্যানার্জী এবং অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক নারায়ণ পণ্ডিত।

সম্মেলন থেকে ৬৭ জনের কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচিত হয়। সভাপতি ফাল্গুনী সরকার, সাধারণ সম্পাদক সুব্রত কুমার গুহ, যুগ্ম সম্পাদকদ্বয় রবীন্দ্রনাথ নন্দী, স্বরাজ চক্রবর্তী, কোষাধ্যক্ষ জ্যোতির্ময় দাস, সংগঠন সম্পাদক প্রশান্ত ব্যানার্জী, দপ্তর সম্পাদক আশীষ মজুমদার এবং স্মারক পত্রিকার সম্পাদক চন্দন কুমার ঘোষ নির্বাচিত হন। আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষিত হয়। □

ওয়েস্ট বেঙ্গল সাব-অর্ডিনেট ফরেস্ট সার্ভিস এ্যাসোসিয়েশনের ৫৯তম রাজ্য সম্মেলন গত ২৫-২৬ জানুয়ারি ২০২০ নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর শহরে কমরেড অজয় মুখোপাধ্যায় নগর এবং কমরেড সতীজীবন তরফদার মঞ্চে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সহ সম্পাদক অনুপ বিশ্বাস। সম্মেলন পরিচালনা করেন সুকুমার ঘোষ, সুশান্ত দত্ত এবং প্রশান্ত সরকারকে নিয়ে গঠিত সংগঠনের স্থায়ী সভাপতিমণ্ডলী। ২৫ জানুয়ারি ২০২০ সকাল ৯টা ২০ মিনিটে লাল পতাকায় সুসজ্জিত নানাবিধ শ্লোগানে মুখরিত বিভিন্ন বডি পোস্টার পরিহিত উপস্থিত প্রতিনিধিদের এক দৃপ্ত মিছিল শহর পরিক্রমা করেন। সকাল ১০টায় শহীদ বেদীতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের কাজ শুরু হয়। অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি নদীয়া জেলার ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক অজিত বিশ্বাস তাঁর সুনিপুণ বক্তব্যে জেলার বিভিন্ন গণআন্দোলনে সুমহান ঐতিহ্যকে তুলে ধরেন। উদ্বোধক অনুপ বিশ্বাস তাঁর বক্তব্যে সংগঠনকে সময়োপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য বিশেষ আহ্বান জানান। এছাড়া সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে বক্তব্য রাখেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নদীয়া জেলার সম্পাদক বিশ্বজিৎ হালদারসহ ১২ই জুলাই কমিটির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃত্ববর্গ। সম্মেলনে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন সমিতির অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক বিভাস দাস। নিরীক্ষিত আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ তাপস দাস। ২৬ জানুয়ারি দুপুর ১২টার সময় দেশের সংবিধান রক্ষা করার শপথ বাক্য সম্মেলন মঞ্চ থেকে পাঠ করা হয়।

২৬ জন প্রতিনিধি সম্পাদকীয় প্রতিবেদন, আয়-ব্যয় এবং উত্থাপিত খসড়া প্রচারের উপর আলোচনা করেন। কেন্দ্রগত, রাজ্যগত দাবিদাওয়াসহ সমিতিগতভাবে ২০টি দাবিদাওয়া সম্মিলিত প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। এছাড়াও আরও ৯টি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনস্বার্থ তথা কর্মচারী বিরোধী কার্যকলাপের উপর প্রস্তাব পেশ হয়। প্রতিনিধিদের উত্থাপিত বিভিন্ন বিষয়সহ সংগঠনের সামগ্রিক কার্যকলাপ প্রভৃতি বিষয়কে গুটিয়ে এনে জবাবী ভাষণ দেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক উল্লাস নাথ। সম্মেলন মঞ্চ থেকে ১৯ জনের কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী, ৫জন স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য সহ ৬০ জনের এক বলিষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়। সভাপতি হিসাবে পুনঃনির্বাচিত হন সুকুমার ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক হিসেবে পুনঃনির্বাচিত হন উল্লাস নাথ এবং কোষাধ্যক্ষ হিসেবে পুনঃনির্বাচিত হন তাপস দাস। সম্মেলনকে কেন্দ্র করে প্রগতিশীল পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন নদীয়া জেলার রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য শঙ্কর ব্যানার্জী। দুই দিনের এই সম্মেলনে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ১জন মহিলাসহ মোট ১৩৫ জন। □

ওয়েস্ট বেঙ্গল লাইভস্টক ডেভেলপমেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্টস্ এ্যাসোসিয়েশনের ২৫তম (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলন গত ৮-৯ ফেব্রুয়ারি পুরুলিয়া জেলায় অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির জেলা দপ্তর কর্মচারী ভবনে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলন উপলক্ষে সম্মেলন স্টলের নামকরণ করা হয়েছিল কমরেড অজয় মুখোপাধ্যায় নগর এবং মঞ্চের নামকরণ করা হয়েছিল কমরেড প্রবীর রায় মঞ্চ।

সম্মেলনের আগের দিন, অর্থাৎ ৭ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় পুরুলিয়া জেলা কর্মচারী আন্দোলনের প্রয়াত প্রবীণ নেতৃত্ব কমরেড প্রবীর দাশগুপ্ত নামাঙ্কিত প্রগতিশীল পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি, পুরুলিয়া জেলা শাখার প্রাক্তন সম্পাদক লালমোহন গ্রহাচার্য। তিনি তাঁর উদ্বোধনী বক্তব্যে বর্তমান সময়ে প্রগতিশীল পুস্তক পাঠের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রয়াত প্রবীর দাশগুপ্তের সহধর্মিনী দেবপূর্ণা মজুমদার দাশগুপ্ত। ঐদিনই সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পুরুলিয়ার ছৌ-শিল্পীরা নৃত্য পরিবেশন করেন।

৮ ফেব্রুয়ারি উদ্বোধনী মিছিলের মধ্য দিয়ে শুরু হয় সম্মেলনের কাজ। প্রায় দুই শতাধিক কর্মচারীর সুসজ্জিত মিছিল পুরুলিয়া শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। পথে বিভিন্ন গণসংগঠনের পক্ষ থেকে উদ্দীপ্ত মিছিলকে সম্বর্ধিত করা হয়। পরবর্তীতে রক্তপতাকা উত্তোলন, শহীদ বেদীতে মাল্যদান ও উদ্বোধনী সঙ্গীতের মাধ্যমে সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা প্রতিনিধিদের স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি তথা পুরুলিয়া জেলা ১২ই জুলাই কমিটির যুগ্ম-আহ্বায়ক তপন রায় চৌধুরী।

সম্মেলনের উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্যতম সহ-সভাপতি প্রশান্ত সাহা।

প্রতিনিধি অধিবেশনের শুরুতে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন সমিতির যুগ্ম-সম্পাদক স্মরজিৎ কিস্কু। আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন সুকুমার দাস। এছাড়াও বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব সম্মেলন মঞ্চে উত্থাপিত ও সমর্থিত হয়। সমগ্র আলোচনার জবাবী ভাষণ দেন সাধারণ সম্পাদক মৃণাল দাস। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি পুরুলিয়া জেলা শাখার সম্পাদক রামাশীষ অধিকারী, অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক গৌরী শঙ্কর লায়েক। ক্রেডেনশিয়াল রিপোর্ট পেশ করেন মৃদুল দত্ত। সম্মেলনের বিশেষ আকর্ষণ ছিল, সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারক বক্তৃতা। বিষয়ঃ 'বারুদ আছে বুকের মাঝে, জ্বালিয়ে রাখি আগুন তাই।' আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীর নেতৃত্ব প্রবীর মুখার্জি। এই আলোচনা সভার মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন লালগড়ের শহীদ কমরেড সালকু সোরেনের মা ছিতামনি সোরেন। সংগঠনের পক্ষ থেকে শহীদের মা'কে সম্বর্ধনা জানানো হয়। আলোচক প্রবীর মুখার্জি তাঁর বক্তব্যে প্রতিকূলতা ভেদ করে এগোনোর আহ্বান জানান, যাতে সালকু সোরেনের মতো শহীদদের রক্ত যেন ব্যর্থ না হয়।

স্বপন চতুর্বেদী, কালিপদ দাস ও পার্থ প্রতীম গোস্বামীকে নিয়ে গঠিত সভাপতি মণ্ডলী সম্মেলনের কাজ পরিচালনা করে।

সম্মেলন থেকে নব নির্বাচিত পদাধিকারীরা হলেন—**সভাপতিঃ** পার্থপ্রতীম গোস্বামী, **সাধারণ সম্পাদকঃ** স্মরজিৎ কিস্কু, **যুগ্ম সম্পাদকঃ** জনা মুর্মু এবং কালিপদ দাস, **কোষাধ্যক্ষঃ** মানব সিংহ রায়, **মুখপত্র 'আলোর পথে' সম্পাদকঃ** লিটন পান্ডে। □

পশ্চিমবঙ্গ (গ্রুপ ডি) সরকারী কর্মচারী সমিতির ৪৭তম (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক শহরে গত ১ ও ২ ফেব্রুয়ারি ২০২০ অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনের আগের দিন অর্থাৎ ৩১ জানুয়ারি ২০২০ কমরেড নির্মল রায় নামাঙ্কিত প্রগতিশীল পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন ঐ জেলার কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণ নেতা শ্যামল সরকার। এই পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্র থেকে সম্মেলনের দুদিনে মোট ৪০ হাজার টাকার বই ক্রয় করেছেন প্রতিনিধিরা।

১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ সকাল সাড়ে ৯টায় তমলুকের শালগাছিয়ায় জেলা কর্মচারী ভবনের প্রাঙ্গন থেকে প্রতিনিধিদের সুসজ্জিত একটি মিছিল শুরু হয় এবং শহরের বিভিন্ন এলাকা পরিক্রম করে সুবর্ণ জয়ন্তী ভবনে প্রবেশ করে। তারপর রক্তপতাকা উত্তোলন করেন সমিতির সভাপতি বিশ্বেশ্বর রায়। এরপর উপস্থিত নেতৃবৃন্দ এবং ভ্রাতৃপ্রতীম সংগঠনের প্রতিনিধিরা শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানটি পরিবেশন করে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সাংস্কৃতি শাখা।

বিশ্বেশ্বর রায়, সজল সরকার, মীনা রায় ও গৌতম দেওঘরিয়াকে নিয়ে গঠিত সভাপতি মণ্ডলী দু'দিন ব্যাপী সম্মেলনের কাজ পরিচালনা করে।

সমিতির ৪৭তম রাজ্য সম্মেলন উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী। অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ডা. কল্যাণময় বসু সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে স্বাগত ভাষণ দেন। উদ্বোধনী অধিবেশনের মঞ্চে অবসরপ্রাপ্ত ৭ জন কেন্দ্রীয় সম্পাদক মণ্ডলী সদস্যকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। এছাড়াও ২০১৯ সালে মাধ্যমিক / উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ঐ জেলার সমিতির সদস্যদের পুত্র-কন্যারা যারা উত্তীর্ণ হয়েছে, প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে তাদের মধ্যে থেকে প্রথম তিনজন ছাত্রছাত্রীকে সম্বর্ধনা জানানো হয়।

উদ্বোধনী অধিবেশন সমাপ্ত হওয়ার পর শুরু হয় প্রতিনিধি অধিবেশন। প্রতিনিধি অধিবেশনে শুরুতে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন যুগ্ম সম্পাদক অলোক ভট্টাচার্য। আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ প্রবীণ নস্কর। খসড়া প্রস্তাবাবলী পেশ করেন সংগঠন সম্পাদক মন্টু দাস। খসড়া প্রস্তাবাবলীর সমর্থনে বক্তব্য রাখেন অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক জয়দেব হাজরা। সংগঠনের নিয়মাবলী সংশোধন সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করেন প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক জয়দেব বকসী।

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে একটি বিশেষ বিষয়ের ওপর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিষয় ছিল, 'আক্রান্ত সংবিধান, বহুত্ববাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও শ্রমজীবী মানুষের করণীয়'। আলোচনা করেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনীর যুগ্ম সম্পাদক অনির্বাণ মুখার্জী। তিনি তাঁর বক্তব্যে সংবিধান ও ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষার স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ওপর জোর দেন। সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রুপ ডি কর্মচারী সমিতির সাধারণ সম্পাদক খোকন পাল। তিনি তাঁর রাজ্যে বি জে পি শাসনের নির্মম অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন। তিনি জানান, ঐ রাজ্যে ইতিমধ্যেই মহার্ঘভাতা ও পেনশন বন্ধ করে দিয়েছে বি জে পি-আর এস এস সরকার।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন অভ্যর্থনা সমিতির কার্যকরী সভাপতি সুকুমার ভট্টাচার্য ও সম্পাদক বনমালী পাণ্ডা। রাজ্য সম্মেলনের মঞ্চে সংগঠনের মুখপত্র সমিতি বার্তার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেন বিশেষ অতিথি খোকন পাল। ক্রেডেনশিয়াল রিপোর্ট পেশ করেন দপ্তর সম্পাদক গোঁরাচাঁদ সরদার। দু'দিন ধরে তিনজন মহিলাসহ মোট ৩২ জন প্রতিনিধি আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। প্রতিনিধিদের আলোচনার জবাবী ভাষণ দেন সাধারণ সম্পাদক প্রশান্ত সাহা। সর্বসম্মতিক্রমে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন ও খসড়া প্রস্তাবাবলী গৃহীত হয়। সম্মেলন থেকে নির্বাচিত পদাধিকারীরা হলেন—সভাপতিঃ প্রশান্ত সাহা, সাধারণ সম্পাদকঃ জয়দেব হাজরা, যুগ্ম সম্পাদকঃ অলোক ভট্টাচার্য, গোরাচাঁদ সরদার, দপ্তর সম্পাদক মণ্টু দাস, কোষাধ্যক্ষ অসীম লাহিড়ী। □

Editor : SUMIT BHATTACHARYA
SANGRAMI HATIAR
State Co-ordination Committee
48th Year, 3Rd Special E-Edition, August 2020
Regd. No. : 18484/71

পি কে ৩

পি কে বা পি কে ব্যানার্জী। অর্থাৎ প্রদীপ কুমার ব্যানার্জী। ফুটবল প্রেমী, ফুটবলের খোঁজ-খবর রাখেন এমন সকলের কাছেই এই নামটা বিশেষ পরিচিত। কিছুদিন আগেই প্রয়াত হয়েছেন। এক সময় ছিলেন সম্ভ্রম জাগানো ফুটবলার। নিয়মিত জাতীয় দলে খেলেছেন। পি কে, চুনী, বলরাম এই ত্রয়ীর খেলা দেখার সুযোগ যাদের হয়েছে, তারা এখনও স্মৃতি রোমন্থন করেন। ফুটবলার হিসেবে জীবন শেষ করে পি কে হলেন কোচ এবং সম্ভবত ভারতের ক্লাব ফুটবলের সফলতম কোচ। নিজের দলের খেলোয়াড়দের উদ্দীপ্ত করার জন্য তাঁর 'ভোকাল টনিক' ছিল বিখ্যাত। এই ভোকাল টনিক নাকি খেলোয়াড়দের এমন তাতিয়ে দিত, যে অনেক কঠিন ম্যাচেও তার দল জিতে ফিরতো। এক কথায় ময়দান সূত্রে এই 'পি কে' আমাদের বিশেষ পরিচিত।

খেলার মাঠ থেকে চলে আসুন চলচ্চিত্রে। বিশেষত হিন্দী ছায়াছবির জগতে। সেখানে, কিছুদিন আগেই আমাদের পরিচয় হলো দ্বিতীয় পি কে-র সাথে। যে অবশ্য বাস্তবের কোনো চরিত্র নয়। একটি রূপোলি পর্দার চরিত্র। তাও আবার এই গ্রহের মানুষ নয়। কয়েক কোটি মাইল দূরের কোনো ভিন-গ্রহ থেকে গবেষণার জন্য এই গ্রহে আসা। কিন্তু রিমোট হারিয়ে যাওয়ার (চুরি) ফলে কিছুদিন থেকে যেতে বাধ্য হয়। এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ভেসে বেড়ানো লাখো গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্যে একটি ছোট্ট গ্রহের এক শহরে ভগবানের নাম করে লোক ঠকানো, ধর্ম নিয়ে ব্যবসা আর হানাহানি দেখে বিচলিত। বাণিজ্যিক ছবির মশলা অর্থাৎ রোমান্স, কমেডি ইত্যাদির মধ্য দিয়ে পিকে যা বলতে চেয়েছে, তা কিন্তু আজকের ভারতে বিশেষ প্রাসঙ্গিক। মানুষের ভাবনা, অন্ধ বিশ্বাসকে নাড়া দিতে পারে এমন কথাই কিন্তু কাহিনীকার ও পরিচালক অভিনেতা আমির খান তথা 'পি কে'-র মুখ দিয়ে বলাতে চেয়েছেন। অর্থাৎ দ্বিতীয় পি কেও আমাদের পরিচিত।

এখন বাংলার আকাশে উদয় ঘটেছে তৃতীয় 'পি কে'-র। কে ইনি? না, ইনি ফুটবল জগতের বা রূপোলি পর্দার কেউ নন। ইনি আদপে একজন ব্যবসায়ী। ওঁর পুঁজি হলো কূট-বুদ্ধি আর ন্যায় বিবর্জিত কৌশল। এই পুঁজি দিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও নেতা-নেত্রীদের পরিষেবা প্রদান করেন। ব্যবসায়ী, কারণ বুদ্ধি ও কৌশল সাপ্লাই করার বিনিময়ে তিনি মোটা অঙ্কের অর্থ পারিশ্রমিক হিসেবে গ্রহণ করেন। শোনা যায়, দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শদাতা ছিলেন এই পি কে। এখন, তার দলবল নিয়ে চলে এসেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে সাহায্য করার জন্য। সাহায্য মানে লোক-ঠকানোর কৌশল শেখাতে।

এ পর্যন্ত শুনে পাঠক বন্ধুরা বিস্মিত হচ্ছেন কি? আপনাদের মনে হচ্ছে কী, এ কেমন কথা? রাজনীতি মানে তো মানুষের জীবন-জীবিকা কেন্দ্রীক নীতির প্রশ্ন। তা থেকে উদ্ভূত আদর্শের দ্বন্দ্ব। সেখানে আবার ইভেন্ট ম্যানেজারের কী কাজ? তাঁর প্রয়োজনটাই বা কোথায়? আপনাদের মনে এইসব প্রশ্নের উদয় হচ্ছে, কারণ আপনাদের চিন্তায় এখনও বুনিয়াদি রাজনীতির সংজ্ঞা গিজ গিজ করছে। ভুলেই গেছেন বোধহয়, বাজার অর্থনীতির যুগে বুনিয়াদি রাজনীতি, নীতি-নিষ্ঠা, আদর্শের প্রতি দায়বদ্ধতাকে বলা হচ্ছে অচল পয়সা বা মিউজিয়ামে সাজিয়ে রাখার মতো 'এ্যান্টিক' সামগ্রী। যারা এখনও বুনিয়াদি রাজনীতির কথা বলে, নীতি-আদর্শের প্রচার করে, আজকের বাজার অর্থনীতিকে তারা 'অপ্রাসঙ্গিক'। এদের দিয়ে কিস্যু হবে না। চ্যাম্পিয়ন তো তারাই, যারা রাজনীতির মইটিকে ব্যবহার করে প্রশাসনিক ক্ষমতার অলিন্দে পৌঁছে লুটে-পুটে খাওয়াটাকে একেবারে অ্যাবস্ট্রাক্ট শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে যেতে পেরেছে। এখন, এই শিল্পটিকে স্থায়ী খাস তালুক বানানোর জন্য জনসমর্থনে ভাঁটা পড়তে দেওয়া চলবে না। কিন্তু নিজেদের বিদ্যা-বুদ্ধির যা দৌড়, তা দিয়ে খুব বেশিদিন লোক ঠকানোর মতো পন্থা খুঁজে নেওয়া কঠিন। আবার প্রশাসনিক ডাণ্ডা আর বাহুবলীদের দিয়েও সবসময় কাজ হাঁসিল নাও হতে পারে। কারণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানুষের 'ব্যাকল্যাশ' বা নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কা সবসময় থাকে। তাই নিত্যনতুন মগজ ধোলাইয়ের মন্ত্র তৈরি করার জন্য 'পি কে'-র মতো ইভেন্ট ম্যানেজারদের ভাড়া করা প্রয়োজন হয়। এই ইভেন্ট ম্যানেজারদের সৌজন্যেই কখনও আমরা দেখি 'দিদিকে বলো', কখনও 'বাংলার গর্ব...' প্রভৃতি।

বাজার অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যই হলো শ্রমের মজুত বাহিনী। কর্মহীন মানুষ। এদের একটা অংশ জীবিকার সন্ধানে, বেঁচে থাকার তাগিদে হয়ে ওঠে বেপরোয়া। অন্ধকার জগৎ এদের আকর্ষিত কোরে লুম্পেনাইস্‌ড্ করে। এই লুম্পেনরাই স্বার্থের দ্বন্দ্বে (ঐ জগতের পরিভাষায় 'বখরা') বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে খুন-জখম-রাহাজানি-ছিনতাই-তোলা আদায় চালাতে থাকলে সমাজের অভ্যন্তরে তৈরি হয় অরাজকতা। লুম্পেনরা বাজার অর্থনীতির সন্তান হলেও, মাত্রাহীন অরাজকতা বাজার অর্থনীতির স্বার্থে ঘা দেয়। অরাজকতার কাদায় বাজার অর্থনীতির চাকাও মাঝে মাঝে আটকে যায়। অনেকটা বখাটে সন্তানেরা যেমন মা-বাবার শান্তি নষ্ট করে।

এই সমস্যা থেকে বেরনোর জন্য বাজার অর্থনীতি একটা রাস্তা বের করে। তাতে লুম্পেনরাও থাকবে, কিন্তু বাজার অর্থনীতির স্বার্থে ঘা লাগবে না। সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না। রাস্তাটা হলো, আচার-আচরণ, শরীরী ভাষা, কথায় লুম্পেনদের নিয়ন্ত্রণ (গুণ্ডা কন্ট্রোল?) ও নেতৃত্ব দিতে পারে এমন একজন খুঁজে বের করে, লুম্পেন গোষ্ঠীগুলোকে এক ছাতার তলায় এনে একটা রাজনৈতিক দল তৈরি করে ফেলা। যাতে চরিত্র না বদলালেও, একটা কেন্দ্র থেকে এরা নিয়ন্ত্রিত হয়। এতে বাজার অর্থনীতির সুবিধা কী? সুবিধা হলো, এতদিন যে সমস্যা ছিল 'হরাইজেন্টাল'—একই সাথে একাধিক গোষ্ঠী শকুনের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ছে, এখন তা হয়ে গেল ভার্টিকাল—লুম্পেনরা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, ওপর থেকে। ওপর থেকে যে নির্দেশ আসছে, তা পালিত হচ্ছে। বাজার অর্থনীতির প্রবক্তারা তখন মাথাকে সবরকমের উপঢৌকন দিয়ে খুশি করে। বলে, যা লাগবে তোমাকে দেব। তুমি বাপু তোমার ছোট ছোট ছেলেদের সামলাও। সেই মতো ওপর থেকে নির্দেশিকা তৈরি হয়— কী কী লুট করা যাবে। লুট করা যাবে সরকারী প্রকল্পের টাকা, পঞ্চায়েত ও পৌরসভার সম্পদ, রেশন সামগ্রী, কৃষকের জমি, মধ্যবিত্তের উপার্জন, শ্রমিকের মজুরি এবং মহিলাদের সম্মান (ছোট ছোট ছেলেদের দুষ্টুমি)। কিন্তু আঁচ লাগবে না পুঁজির মালিকদের গায়ে। এই বিশেষ ধরনের রাজনৈতিক দল, যাদের কোনো নীতি-আদর্শের বালাই নেই, কিছুদিন যেতে না যেতেই ক্ষমতার স্রোতের ধাক্কায় হালহীন নৌকোর মতো অবস্থা হয়। তখন তাকে সামলানোর জন্য ডাক পড়ে পি কে বা ঐ ধরনের ইভেন্ট ম্যানেজারদের।

বিহার, উত্তরপ্রদেশ ঘুরে পি কে এই রাজ্যে এসে তার কাজ শুরু করেছিলেন। তাকে বোঝানো হয়েছিল, এ রাজ্যে বামপন্থীরা আর কোনো ফ্যাক্টর নয়। এখানে লড়াই আপনার পুরোনো আর নতুন কাস্টমারের মধ্যে। ফলে পি কে বাবুও অন্য রাজ্যের মতোই এ রাজ্যেও তার পরিকল্পনা সাজাচ্ছিলেন। সেই মতো দুই পক্ষের মক-ফাইটের চিত্রনাট্যও রচিত হচ্ছিল প্রতিনিয়ত। চোখা চোখা সংলাপে ঝালাপালা হচ্ছিল রাজ্যবাসীর কান। কিন্তু ঠাণ্ডা ঘরে বসে পি কে-র ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টে বাদ সাধলো করোনা। করোনাজনিত পরিস্থিতিতে দুর্গত মানুষ, যাদের কাছে সরকার পৌঁছোল না, তাদের কাছে পৌঁছে গেল বামপন্থীরা। পরিযায়ী শ্রমিক থেকে শুরু করে অসহায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। ফলে বামপন্থীদের প্রতি পুনরায় আস্থা ফিরে আসতে শুরু করলো মানুষের মনে। নড়ে-চড়ে বসলেন পি কে। নতুন করে পরিকল্পনা সাজালেন। গ্রামে-শহরে লাল ঝাণ্ডা কাঁধে যে মানুষগুলোকে আপন করে নিচ্ছেন গ্রামবাসী-শহরবাসী, টাকার থলি আর অন্যান্য প্রলোভন নিয়ে তাঁদের কাছেই পৌঁছোতে শুরু করলো পি কে-র বাহিনী। লক্ষ্য বামপন্থীদের ভাবমূর্তিকে কালি মাখিয়ে তাদের পুনরুত্থানের সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করা। কিন্তু কর্পোরেটজীবী পি কে মাঠ-ময়দান, কল-কারখানা, অফিস-আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং মহল্লায় মহল্লায় আন্দোলন সংগ্রামের প্রখর তাপে লৌহময় দৃঢ়তায় গড়ে ওঠা বামপন্থী আদর্শকে জানেন না। তাই শুরু থেকেই ধাক্কা (বা ঘাড়ধাক্কা) খেতে শুরু করেছেন। বামপন্থী আদর্শ লখীন্দরের বাসর ঘর নয়। এতে কোনো ছিদ্র নেই। অতএব তৃতীয় পি কে ডাহা ফেল। □

সুমিত ভট্টাচার্য

কর্মী সঙ্কোচন করতে চলেছে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার

কথায় বলে... মাসতুতো ভাই। বর্তমানে রাজ্যে ও কেন্দ্রে যারা সরকার চালাচ্ছে, বিভিন্ন বিষয়ে তারা যে একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ, তার অজস্র উদাহরণ রয়েছে। সম্প্রতি তেমনই একটি উদাহরণ হলো, কেন্দ্র ও রাজ্য প্রশাসনে কর্মরত কর্মচারীদের সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ।

কেন্দ্রীয় সরকারী দপ্তরগুলিতে প্রায় সাত লক্ষ অনুমোদিত পদ শূন্য। এই তথ্য সরকার নিজেই দিয়েছে লোকসভাকে। অথচ দেশের অভ্যন্তরে বিপুল বেকার সমস্যা সত্ত্বেও শূন্যপদগুলি পূরণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে, সরকারী কর্মচারীর সংখ্যা আরও কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। চালু করা হবে আগাম অবসর প্রকল্প। ৫০ বা ৫৫ বছর বয়স হয়ে গেছে এবং ৩০ বছর চাকরি করেছেন, এমন কর্মচারীকে মাত্র তিন মাসের নোটিশে চাকরি থেকে বসিয়ে দিতে পারবে সরকার। সম্প্রতি এমনি একটি পরিকল্পনা প্রকাশ করেছে প্রধানমন্ত্রীর হাতে থাকা কর্মীবর্গ ও প্রশিক্ষণ দপ্তর। এবং এই পরিকল্পনা নাকি জনস্বার্থে গ্রহণ করা হচ্ছে। অর্থাৎ একজন কর্মচারীকে অবসরগ্রহণের আগে বসিয়ে দেওয়াও জনস্বার্থ? এই কাজ করার জন্য কোনো নতুন আইন প্রণয়ন না করে, ১৯৭২ সালের পেনশন সংক্রান্ত একটি বিধিকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে প্রকাশিত নয় পাতার সার্কুলারে বলা হয়েছে সততা ও দক্ষতাকে এই ক্ষেত্রে মানদণ্ড হিসেবে ব্যবহার করা হবে। মানে সরকারই ঠিক করবে, কারা পুরো মেয়াদ চাকরি করবে, কারা করবে না। মানে প্রশাসনের অভ্যন্তরে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করার জন্য, একটি তামাদি হয়ে যাওয়া আইনকে ঝুলি থেকে বের করে রং-চং মাখিয়ে কর্মীদের ঘাড়ে কোপ মারার জন্য ব্যবহার করবে।

একই পথে হাঁটছে রাজ্য সরকারও। রাজ্যে অনুমোদিত শূন্য পদের সংখ্যা ২ লক্ষ ৩ হাজার। কিন্তু এই শূন্য পদগুলি পূরণ করা তো দূরের কথা, করোনা-উত্তর স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে কর্মরত কর্মী সংখ্যাও হ্রাস করা হবে। এমনই সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে নবান্ন। বহুদিন আগেই মুখ্য সচিবের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। ঐ কমিটির অন্যতম এজেন্ডা ছিল কর্মী সঙ্কোচন। এখন অতিমারিজনিত পরিস্থিতিকে ব্যবহার করে ছাঁটাই-এর পরিকল্পনা গতি পেয়েছে। মহার্ঘভাতার বঞ্চনা, পে-কমিশনের ইতিহাসে সর্বনিম্ন বেতন বৃদ্ধির পর এবার কর্মী সঙ্কোচন।

কারা যেন বলে কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসকদলের অহি-নকুল সম্পর্ক? □

সম্পাদক ঃ সুমিত ভট্টাচার্য
সহযোগী সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
যোগাযোগ ঃ দূরভাষ-২২৬৪-৯৫৯৩, ২২৬৫-০৯২৬ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২১৭-৫৫৮৮
ই-মেল ঃ sangramihatiar@gmail.com
ওয়েবসাইট ঃ www.statecoord.org
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত।